অনুবাদ পত্রিক

মাত্র অনুবাদেরই বাংলা ত্রৈমাসিক

দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সেরা সংক

চতুর্থ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা

॥ এবারের সংখ্যায় ॥

গল্প ॥ হোলি (ওড়িয়া) বামাচরণ মিত্র ● প্রেয়সীর মতো (হিন্দী) মমতা কালিয়া ● দশ বাই আট (পাঞ্জাবী) কর্তার সিং দুগগ্‌ল ● অন্য আর এক তীরে (রাশিয়া) আলেকজাণ্ডার পলেভিচ ● এমিলিকে একটি গোলাপ (আমেরিকা) উইলিয়ম ফক্‌নার

কবিতা ॥ অমরুশতক থেকে (সংস্কৃত) ● সোনালী জ্বালা (অসমীয়া) নীলমণি ফুকন ● দুটি কবিতা (সাঁওতালী) মহাদেব হাঁসদা ● অনাথের অশ্রু (ফারসী) পরভীন ইতেশামী ● ভালবাসার সবুজদ্বীপ (পর্তুগীজ) অগাস্তিনো নেটো ● চৈনিক কণিকা (চীনা) ● ধূসর নিলীমা (আমেরিকা) ল্যাঙস্টোন হিউজেস ● মধুশালা (উর্দু) ডঃ তাসীর

প্রাচীন সাহিত্য থেকে ॥ পবনদূতম্ (সংস্কৃত) কবিরাজ শ্রীধোয়ী মেঘদূত (সংস্কৃত) মহাকবি কালিদাস

প্রবন্ধ ॥ নজরুল ঃ দিনকর ● রাজস্থানী লোকসাহিত্য ও বিবাহসঙ্গীত ● ফৈজ আহমেদ ফৈজ

নাটক ॥ আসা আর যাওয়া/স্যামুয়েল বেকেট

গ্রন্থপরিচয় ॥ শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য/শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

মুখ্য উপদেষ্টা ॥ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ⊙ **সম্পাদক** ॥ ডঃ স্বরাজ সেনগুপ্ত ⊙ বৈশম্পায়ন ঘোষাল

সহযোগী সম্পাদক ॥ চৈতন্য দেব ⊙ **সহ সম্পাদক** ॥ মনোজ সরকার

dreamland

for

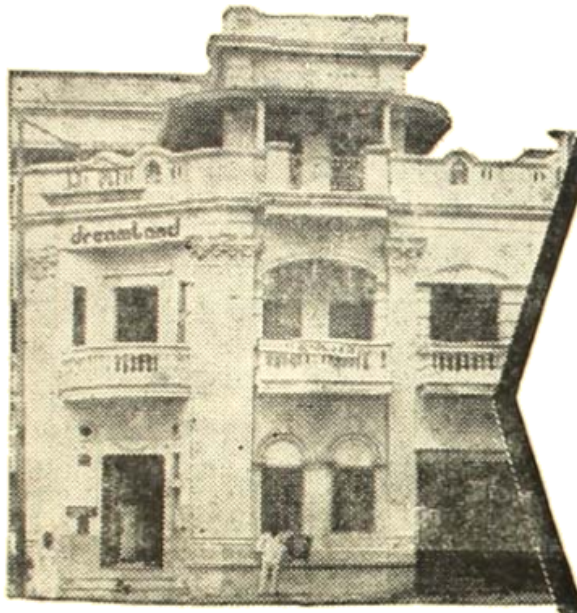

complete medical care

2, NAYRATNA LANE
CALCUTTA-700004
PHONES 54-1245
54-2218
54-3217

- নার্সিং হোম
- প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটারী
- কেমিষ্ট সপ্ (ঔষধের দোকান)
- এক্সরে ক্লিনিক
- অপ্টিক্যাল
- বিশেষজ্ঞ কেন্দ্র (স্পেশালিষ্ট সেণ্টার)

বিভাগ সমূহ ঃ

- শিশু
- মেডিসিন ও কার্ডিওলজি
- সার্জারী (অর্থোপেডিক ও প্লাস্টিক সহ)
- চর্ম ও যৌন রোগ
- স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি
- দন্ত
- মানসিক
- নাক, কান ও গলা
- চক্ষু
- তোতলামি ও কানে কম শোনা

UECO/UDAYAN/DL77

চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপারে আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারে

ড্রিমল্যাণ্ড

শ্যামবাজার ট্রামডিপোর নিকট

ফোন ঃ ৫৪-১২৪৫
৫৪-৩২১৬
৫৪-৩২১৭

অনুবাদ পত্রিকা
বর্ষ: ৪
সংখ্যা: ৯

For Specialised Tea Services :

(a) Finance & budgetary advice.

(b) Manufacturing advice.

(c) Plantation advice.

(d) Tea Factory design & turn-key.

CONTACT

TEA CONSULTANCY & PLANTATION SERVICES PVT. LTD.

(A. J. THOMAS ENTERPRISE)

Nilhat House

11, R. N. Mukherjee Road.

Calcutta—700 001

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

With best compliments of :

Sri Jagdish Chand Agarwal

CALCUTTA

Remember—If you want peace of mind, do not find fault with other, rather see your own Faults—
Holy Mother.

A BENGALI QUARTERLY OF TRANSLATION

ANUBAD PATRIKA

অনুবাদ পত্রিকা

(দেশী ও বিদেশী সাহিত্যের সেরা সংকলন)

চতুর্থ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-জুন, ১৯৭৮

॥ মুখ্য উপদেষ্টা ॥
ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

॥ সম্পাদক ॥
ডঃ স্বরাজ সেনগুপ্ত
বৈশম্পায়ন ঘোষাল

॥ যুগ্ম সম্পাদক ॥
অলকা উকিল
ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
চৈতন্য দেব

॥ সহ সম্পাদক ॥
মনোজ সরকার

॥ পৃষ্ঠপোষক ॥
জ্যোৎস্নাময় মিত্র

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥
শ্রীনিলীনা আব্রাহাম

ডঃ অরুণ দত্তগুপ্ত — ডঃ কালীপদ মালাকার
ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত : — ডঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত
ডঃ দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : — শ্রীশ্যামাপদ সামন্ত
শ্রীসন্ধ্যা গুহরায় — শ্রীবিধান ঘোষাল
শ্রীনারায়ণ পোদ্দার — শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র চৌধুরী — শ্রীকরুণাপদ দত্ত
শ্রীবরুণ রায় — শ্রীবিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়
শ্রীতরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ ॥
ডিজাইন এণ্ড কম্যুনিকেশনস্

With best compliments from

M/S. G.Pharma

52/A, S. B. Neogi Garden Lane

Barahanagar

CALCUTTA

With best compliments of

Rolling Mills India

228, G. V. M. M. Industrial Estate

Odhav, Ahmedabad

Manufactures of :

Stainless Steel sheets, Strips, Plates and

Rolling Mill Machineries.

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

নিয়মিত পড়ুন ও অন্যকে পড়ান

●প্রচার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি●

বছরের যে-কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। বার্ষিক চাঁদা : ৭.৫০ টাকা। ষান্মাসিক চাঁদা : ৩.৭৫ টাকা।

প্রতি সংখ্যা : ১৫ পয়সা

মণি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা :— ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশান্‌স গভর্নমেণ্ট অব্‌ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ২৩ আর. এন. মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০০১।
(ক্রশ্‌ড চেক বা পোস্টাল অর্ডারও এই নামে পাঠানো যেতে পারে।)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

সুকান্ত মূল্যায়ণ……৫.০০
পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা……১৫.০০
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি……
গঙ্গাসাগর মেলা……২.০০

(প্রত্যেকটি বই তথ্যের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান)

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ, ৩৮ গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭
প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র : নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৩৬৭৪/৭৮

SPACE DONATED BY :—

M/S GORA CHAND ROY

396, Rabindra Sarani

Calcutta—700 006

Space Donated By :—

S. K. BANERJEE

34 A, B. K. Paul Avenue.

Calcutta—700 005

সম্পাদকীয়

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like young birds in soft summer hours)
Their wings, to try thier strength —Derozio

কর্ম হতে মুক্তির তথাকথিত ঐতিহ্যকে নয়—কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতিক সত্তাকে নব নব রূপে রূপায়িত এবং স্পন্দিত করার সাধনাই ছিল রেণেসাঁসের সাধনা।

এই বোধ এবং উপলব্ধিই ক্রমশঃ বিভিন্নরূপে এবং পরিপ্রেক্ষায় একদিকে রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয় কুমার প্রমুখের কর্মে ও চিন্তায় এবং অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ সমাজ ও শিক্ষাসংস্কারে প্রতিভাত হল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বোধ এবং উপলব্ধির একটি ধারা রূপ পেল মধুসূদনের গভীর সংবেদনশীল সৃষ্টি কর্মে। শিল্পসৃষ্টির জগতে মধুসূদন প্রথম চিত্তজাগরণের কবি যিনি ভারতীয় প্রশান্ত চেতনায় ইউরোপীয় সংগ্রামী জীবনবোধ বহন করে আনলেন। রামমোহন যেমন রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে বিশ্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধের সন্ধান পান নি—বরং দীর্ঘদিন স্বীকৃত কৃষ্ণচরিত্রের ভ্রান্তনীতিবোধের নির্মম সমালোচনা করে গেছেন, তেমনি মধুসূদন রামায়ণের সনাতন ভাস্ত ও চরিত্রকে সমূলে আঘাত করলেন মানব মহত্বের নতুন ভাবনার মাধ্যমে। আমাদের ধারণায় মধুসূদনের সৃষ্টিকর্মে মানবমহত্বের মৌলস্বরূপ অদ্যাবধি কোনো লেখক সার্থকভাবে উদ্ঘাটিত করতে সক্ষম হন নি।

এই প্রসঙ্গেই রামমোহন-ডিরোজিওর চিন্তা ও মানসিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কর্ম ও সাধনার মৌল সাদৃশ্যের দিকটা স্মরণীয়। কারণ, অধিকাংশ লেখকই তাঁদের চিন্তার বৈপরীত্য দেখাতে উৎসাহী; অথচ মানব মহত্বের গুরুত্ব নির্দেশ করার ক্ষেত্রে এই দুই আপাতবিপরীত ধারার আন্তর ঐক্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। রামমোহন এবং ডিরোজিও স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা এবং বিশেষ করে মননশক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপরে গভীর গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। ডিরোজিও তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে একদিকে হিউমের যুক্তিবাদী দর্শন, অন্যদিকে রীড ও ষ্টিউয়ার্টের আত্মপ্রত্যয়ের নিশ্চয়তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটা উদার মানবিকতার প্রসার ছাড়া জাতিক কিম্বা সামাজিক সত্তার উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। আবার রেণেসাঁস আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিবর্গের স্বদেশানুরাগের গভীরে আছে রামমোহন-ডিরোজিওর স্বদেশপ্রীতি। ডিরোজিওর শিক্ষা এবং তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে বৈনাশিক খুরবাদের (Nihilism) কোনো স্থান ছিল না। মননশক্তির গুরুত্ব, আত্মপ্রত্যয়ের অনুসন্ধান, ঐতিহ্যের যুক্তিবাদী মূল্যায়ণ, এবং জাতিক সত্তার পুনর্জাগরণে উদার মানবিকতা—এই মানসিকতার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তার কোনো বিরোধ নেই।

ইতিহাসে পুরোগামী মহান ব্যক্তিরা চিরদিনই নিঃসঙ্গ পুরুষ, সমকালের সঙ্গে তাঁদের চিত্ত ও ভাবজগতের দুস্তর পার্থক্যের বেদনা এবং অস্তিত্বের গভীরতম জীবনবোধের প্রকাশই হয়ত বিষণ্ণতা। অনুরূপ বেদনা, নিঃসঙ্গতা এবং বিষণ্ণতা অনুভব করে গেছেন রামমোহন, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র, এবং আরো অনেকে, অনুভব করে গেছেন ইউরোপের রেণেসাঁসের মহান ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরাও।

সুতরাং নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতাকে চরিত্রের দুর্বলতা মনে করে আজ যাঁরা রামমোহন কিম্বা ডিরোজিওকে অভিযুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁরা ভুলে যান যে রামমোহন-ডিরোজিওর ব্যানধারণার জগতের সঙ্গে তাঁদের সমকালীন যুগের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত বেশি।

With best compliments from :—

INDERSONS CORPORATION

P-49, Princep Street

Calcutta—13

Space Donated By :-

DIPAK SIRCAR

SIRCAR FOOT WEAR

College Street

॥ সূচীপত্র ॥

॥ গল্প ॥

হোলি (ওড়িয়া) বামাচরণ মিত্র		জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার
প্রেয়সীর মতো (হিন্দী) মমতা কালিয়া		প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ
দশ বাই আট (পাঞ্জাবী) কর্তার সিং দুগ্‌গল		ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অন্য আর এক তীরে (রাশিয়া) আলেকজাণ্ডার পলেভিচ	৪৯	বিপুল রায়
এমিলিকে একটি গোলাপ (আমেরিকা) উইলিয়ম ফকনার	৬০	তপন চট্টোপাধ্যায়

॥ কবিতা ॥

অমরুশতক থেকে (সংস্কৃত)	৩৮	হরেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী
সোনালী মালা (অসমীয়া) নীলমণি ফুকন	৩৯	সনন্ত তাঁতি
দুটি কবিতা (সাঁওতালী) মহাদেব হাঁসদা	৪০	মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
অনাথের অশ্রু (ফারসী) পরভীন ইতেশামী	৪১	আবদুস সাত্তার
ভালবাসারসমুদ্রদ্বীপ(পর্তুগীজ)অগাস্তিনো নেটো	৪২	রেজাউল হক মানিক
চৈনিক কণিকা (চীন)	৪৩	অতুল কুমার দত্ত
ধূসর নিলীমা (আমেরিকা) ল্যাংস্টোন হিউজেস	৭২	অমল চক্রবর্ত্তী
মধুশালা (উর্দু) ডঃ তাসীর	৭৩	পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়

॥ প্রাচীন সাহিত্য থেকে ॥

পবনদূতম্ (সংস্কৃত) কবিরাজ শ্রী ধোয়ী		নচিকেতা ভরদ্বাজ
মেঘদূত (সংস্কৃত) মহাকবি কালিদাস		অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

॥ প্রবন্ধ ॥

নজরুল : দিনকর	৯	ডঃ কল্যাণী মণ্ডল
রাজস্থানী লোকসাহিত্য ও বিবাহ সঙ্গীত	১৪	জ্যোতির্ময় দাশ
কৈফ আহমদ কৈফ	৭৪	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ নাটক ॥

আসা আর যাওয়া (আমেরিকা) স্যামুয়েল বেকেট	৬৮	মনোজ চাকলাদার

॥ গ্রন্থপরিচয় ॥

শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য	৭৯	বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

অরণ্য সম্পদের উন্নয়ন

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক উত্তরবঙ্গে বহুমুখী অরণ্য উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ।

পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য সম্পদ এই রাজ্যের অরণ্যজাত দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়।

এই বিরাট ব্যবধান দূর করতে ও দেশ ও জনগণের স্বার্থে সুস্পষ্ট লক্ষ্যের ভিত্তিতে রচিত প্রকল্পের মাধ্যমে সাত রকম ভাবে অরণ্য সম্পদ উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের সাফল্য জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর নির্ভরশীল।

☐ পার্বত্য অঞ্চলে এলাবৎকাল অব্যবহৃত অরণ্য সম্পদের উন্নয়ন ও তার সদ্ব্যবহার।

☐ অরণ্যজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও পরিবহণের সুবিধার জন্য গভীর অরণ্যে (অন্তত ৫০০ কি.মি.) রাস্তা নির্মাণ।

☐ আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও রোপওয়ের (রজ্জুপথের) সাহায্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃক্ষচ্ছেদন ও পরিবহণ।

☐ অরণ্যভিত্তিক শিল্পসমূহের উন্নয়নের জন্য নিয়মিত কাঁচামালে সরবরাহের ব্যবস্থা।

☐ উত্তরবঙ্গে একটি কাগজকল স্থাপনের জন্য আগামী দশ বছরে বাড়তি ৯০০০ হেক্টর জমিতে বিশেষ ধরনের বৃক্ষরোপণ প্রকল্প।

☐ অরণ্যের আদিম ও অপরূপ পরিবেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।

☐ উত্তরবঙ্গের এযাবৎকাল অনগ্রসর এলাকাগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অগ্রগতি ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ।

আপনার শিল্পের প্রয়োজনে অরণ্যজাত দ্রব্যাদি ও কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, ৮ম তল,
কলিকাতা-৭০০০১৩।

WBFD 1393

Space Donated By

(Mill : 55-4232
(H.O. : 33-1293

Ms. Calcutta Flour Mills

Always use Canon Brand

Atta, Maida, Suji, Bran

242/1, A. P. C. Road

Calcutta-700 004

PAKUR QUARRIES (P) LTD.

QUARRY OWNER

Mines :
P. O. Pakur
Dist : Santhal Pargana
Bihar
Phone No : PKR -68

Head Office :
3.1, Bankshall Street
Calcutta -1
Phone : 23-5511

With Compliments of :

Protapchandra Dey Amiyakumar Dey & Bors.

YARN MERCHANTS

City Office :
166, Mahatma Gandhi Road
Calcutta—700 007
Phone : 33-5065

Regd. Office
54, Ramdulal Sircar Street
Calcutta—700 006
Phone : 55-1751

Telegrem : CONEYARN

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম
ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

কলিকাতা—১৩

"তন্তুশ্রী" তাঁতবস্ত্রের প্রতীক

'তন্তুশ্রী নিশ্চিত ভাবে আপনাকে দেয় :—

ঠাস-বুনটের সেরা তাঁতবস্ত্র।
আভিজাত্যপুর্ণ ডিজাইন
অনবদ্য বর্ণ—বৈচিত্র্য।
সঠিক দামে সেরা গুণমান।
টাঙ্গাইল, ধনেখালি, ঢাকাই, বেগমপুরী,
ও শান্তিপুর শাড়ীর অপুর্ব সমাবেশ।

বাংলার তাঁতশিল্প দেশের গৌরব। তাঁত শিল্পীদের মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করে এই কর্পোরেশন আজ তাদের সামিল করেছে নিজেদের উৎপাদন কেন্দ্রে। এরই সঙ্গে চলেছে নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রের সম্প্রসারণ।

• শো রুম ও দোকান •

(১) তন্তুশ্রী : ১৫৯/১এ, রাসবিহারী এ্যাভেন্যু-কলি – ২৯ ; (গড়িয়াহাটা মোড়)

(২) তন্তুশ্রী : ১২৮/১এ, বিধান সরণী, কলি—৪; (শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়)

(৩) তন্তুশ্রী : ১৮ এ, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া

(৪) বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বালুরঘাট, কুচবিহার

(৫) তন্তুশ্রী : নিউদিল্লী (শীঘ্রই খোলা হচ্ছে)

Space Donated by :—

CAPSTAN WIRE PRODUCTS (P) LTD.

7 HARE STREET

CALCUTTA—1

Phone : 23-1340

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

Berlls Chemicals & Traders (P) Ltd.

ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা

"অঙ্গীকার বদ্ধ"

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে আমাদের অবদান

সুলভ সুষম সার :—

"রক ফসফেট"

(ভারত সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক সার হিসাবে এই রক ফসফেট পাউডার ব্যবহারের সুপারিশ আছে)

অম্ল জমির জন্য একটি প্রধান সার

অম্ল জমিতে ধীরে ধীরে ফসফেট নির্গত হওয়ার ফলে জমিকে বহুদিন উর্ব্বর রাখে। কম অম্ল জমি বা নিরপেক্ষ মাটিতে গোবর সার বা কম্পোষ্ট সারের সহযোগে এই সার অত্যন্ত কার্যকর। নানারকম অম্লখাদ্য থাকায় ইহার কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধান, গম, পাট, আলু, আনারস ইত্যাদি চাষে বিশেষ কার্যকরী। চা চাষের জন্য এই সারের উপযোগীতা "টেকলাই গবেষণা কেন্দ্র" কর্তৃক সমর্থিত। কফি, রবার, তুঁত ইত্যাদি চাষেও ইহার কার্যকারিতা আছে। ডিলারগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভলপমেণ্ট এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ

১৩, লিণ্ডসে ষ্ট্রিট (২য় তল)

কলিকাতা—১৬

স্বপন পুরী

রাঁচী রোড্

পুরুলিয়া

With best compliments from :

SAJJAN KAYAN

Director

METAL PRESS WORKS LTD.

165, Lower Chitpore Road
Calcutta - 700 073

With best compliments from

THE FIRST CEMENT FACTORY IN WEST BENGAL

DURGAPUR CEMENT WORKS

Prop. Birla Jute Manufacturing Co. Ltd

DURGAPUR (W.B.)

With the best compliments of :

Madho Prasad Company

Carpet Manufacturers & Exporters
North to UCO. Bank Chak Saif Main Road

Bhadohi – 221401

VARANASI, U.P,

Phone :—384

With best compliments from :

M/s. Tindal Steel Tube Corporation

29, Strand Road,

Calcutta

Dealers & Exporters of Pipe Fittings

নজরুল : দিনকর

ডঃ কল্যাণী মণ্ডল

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের (বাংলা ও বিহার) দুই ভাষার এই প্রতিভাশালী কবি নজরুল এবং দিনকর। হিন্দী সাহিত্যে কবি শ্রী রামধারী সিং 'দিনকর' একটি স্মরণীয় ও শ্রদ্ধের নাম ; একটি অধ্যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের যুগান্তরের কবি ; যুগচারণ। জীবনবাদী কবি 'দিনকর' স্মরণ করেছেন, ভাবগত নৈকট্য। অনুভব করেছেন জীবনবাদী, মানবতাবাদী, কবি কাজী নজরুলের। এই রাষ্ট্রিয়তা কেবলমাত্র দেশের ভৌগলিক সীমার বন্দনাগানে মুখর হয়নি ; সাংস্কৃতিক গরিমা, প্রশস্ত মানবতাবোধের উপলব্ধি, ঐতিহ্যের মহিমা, বর্তমানের দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ এবং ভবিষ্যতের স্বর্ণউজ্জ্বল স্বপ্নের মাধুরী বিমিশ্র হয়ে থাকায় সৃষ্টির সার্থক উদাহরণ হয়েছে।

নজরুল ইসলামের মতই 'দিনকর' বহুবিচিত্র পথের আস্বাদ পেয়েছিলেন, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় সৃষ্ট সাহিত্যে। একই যুগচেতনা, যুগধর্ম উভয় কবিকেই উদ্দীপ্ত করেছে-তাদের মানসগঠনে, তার অবয়বীকরণে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তীব্র দহন জ্বালা স্বাধীনতার প্রচণ্ড আবেগ উভয়কেই সমভাবে উদ্দীপ্ত করেছে, এবং তারই অভিব্যক্তি ঘটেছে অগ্নিগর্ভ কাব্যে, প্রবন্ধে, গল্পে কখনও নাটকে। পরাধীন ভারত কেবল স্বাধীনতা প্রাপ্তির অগ্নিতপস্যা নয়, কেবল সূর্যোদয়ের সম্ভাবনার রক্তনির্ঘোষ নয় ; স্বাধীনতাকে সার্থক রূপায়নের জন্য চাই শান্তি,সাম্য ও প্রগতির অনুকূল পরিবেশ।

নজরুল বা দিনকর কেউই নির্জনতার কবি নন। মানুষের কবি, জনতার কবি। এই মানুষ বা এই জনতা দেশকালের আপেক্ষিকতার সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের সর্বহারা মানুষের মুক্তির দাবী, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী পৌরুষ দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সীমার ব্যবধানকে উত্তীর্ণ হয়েই উভয় কবি বেদনার্ত পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্যের রূপকার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। মানুষের কর্মে ও স্বপ্নে একাত্ম হয়ে জড়িত থাকার ঐকান্তিকতা এঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রত্যক্ষীভূত। মানবিকতা বোধ, বিশ্ববীক্ষা, মানুষের সার্বিক উত্তরণে কবিদ্বয়ের পরম বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্ট সাহিত্যে বিধৃত। জীবনদৃষ্টি, কাব্যবোধ ও সমাজচেতনা বিজ্ঞান নির্ভর এবং সমকালীন। আবার উভয়েই ভারতীয় ক্রববাদী সাহিত্যের উত্তরাধিকারী। রামায়ন, মহাভারত, উপনিষদ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মণিভাণ্ডার থেকে রত্ন সংগ্রহ করে স্ব স্ব সৃষ্টিতে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল কাব্যে এর অতিরিক্ত মিশ্রন ঘটেছে ইসলামী ধর্ম ও সাহিত্যিক আদর্শের। আবার উভয়েই উর্দু সাহিত্যের বহুৎ ঐতিহ্য থেকে বিচিত্র ছন্দ এবং রসের সন্ধান পেয়েছেন সমভোগে।

'দিনকর' সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচক। অনেকেই তাঁকে হিন্দীকাব্য সাহিত্যের 'নজরুল' নামে অভিহিত করেছেন। এঁরা নজরুল ইসলামের সংগে দিনকরের সধর্ম এবং ভাব মাধুর্য উপলব্ধি করেছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের তৃতীয় কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই পটভূমিটি হল নজরুলের আবির্ভাব ও বিকাশের পটভূমি। এই পটভূমি দিনকরেরও। এই পটভূমির আধারেই এদের মানস চৈতন্য পরিপূর্ণ হয়েছে,

এঁদের জীবনে ও কাব্যে তাই এই যুগচেতনা, যুগমানস একান্তভাবে জাগ্রত। এদের কাব্য বিচারে এই যুগবাণী তাই অনস্বীকার্য মানদণ্ড। এই মানদণ্ডেই এঁদের বিচার করতে হবে। যুগচেতনার বলিষ্ঠ ঘোষণায়, যুগবাণীর প্রাণবন্ত সোচ্চারে, সর্বপ্রকার পরাধীনতার বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ বিদ্রোহে কবিদ্বয়ের কাব্যিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত।

"দিনকর" বয়:কনিষ্ঠ। ১৯০৮ খ্রী: বিহার প্রান্তের মুংগের জেলার অন্তর্গত সিমরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বসূরী নজরুল তাই স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর উত্তরসূরীর মানসচৈতন্যে এই বিদ্রোহী ভাবটিকে প্রজ্বলিত করতে সাহায্য করেছেন। এ সত্য অবিসংবাদিত। দিনকর হিন্দী সাহিত্যের পথিকৃৎ ভারতেন্দু, মৈথিলীশরণ রামনরেশ ত্রিপাঠী, সুভদ্রা কুমারী চৌহান, মাখনলাল চতুর্বেদী, বালকৃষ্ণ শর্মা, নবীন প্রভৃতির স্বদেশচিন্তা, স্বদেশ প্রেম এবং ওজস্বিতার অগ্নিগর্ভ উত্তাপে উত্তপ্ত হয়েছে। এই ভাবনা তীব্রতর হয়েছে ঘালী, চকবস্ত এবং ইকবালের তেজ:দৃপ্ত ভাবনার আবেগের সংস্পর্শে। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বড় কম পড়েনি দিনকরের জীবনে এবং কাব্যে। তাই একদিকে যেমন কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ দিনকরের কাব্যিক আদর্শকে পুষ্ট করেছেন অন্যদিকে তেমনি নজরুল দিনকরের চিরঅশান্ত, চিরবিদ্রোহী চেতনাকে বলিষ্ঠ জীবনতৃষ্ণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। দিনকর আত্মজীবনীতে একথা শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করেছেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মথ নাথ গুপ্তের বক্তব্য—"দিনকরকে রসগ্রাহিনী শিরাএঁ সংস্কৃত ঔর বঁগলা সে ভী সম্পৃক্ত থী, অতএব এক ওর জহাঁ উনমে কালিদাস ঔর রবীন্দ্র কা প্রভাব পহুঁচা, বহাঁ দুসরী ওর কাজী নজরুল ইসলাম কা আক্রামক ঔর সংক্রামক গর্জন ঔর সিংহনাদ ভী উনকী আবাজ কী ত্রিবেণী মেঁ আ মিলা। নজরুল, জোশ ঔর দিনকর, ভারত কী ক্রান্তিকারী কবিতাকে বৃহৎ ত্রয়ী কে কবি হৈঁ, ঔর ইনতীনোঁ কবিয়োঁ কা স্বর বহুত কুছ সমান রহা হৈ। তীনোঁ মেঁ চুন্নে বালে কো একহী তরহ কী কমিয়াঁ মিলেঙ্গী, ঐসী কমিয়াঁ জো যুগ তথা যে কবি জিসবর্গ সে আএ, উসে দেখতে হুএ অনিবার্য থী। অব দিনকর পূর্ণরূপ সে উদিত হুএ, নজরুলকী অগ্নিবীণা মৌন হো রহী থী।[১] দুর্ভাগ্যবশতঃ নজরুলের কবিকণ্ঠ ১৯৬২ খ্রী: মাঝামাঝি থেকে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায় গভীর নীরবতায়। আর একাল দিনকর প্রতিভার পূর্ণবিকাশের কাল। দিনে দিনে তা পূর্ণতর হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে চরম সাফল্যে ১৯৭৪ খ্রী: দেহাবসানের পূর্ব পর্যন্ত দিনকর সাহিত্য সাধনা করেছেন। স্বদেশে ও বিদেশে সম্মানিত হয়েছেন।

'দিনকর : সৃষ্টি ঔর দৃষ্টি' গ্রন্থের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রী গোপাল কৃষ্ণ কৌল এবং শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন—"স্বাধীনতা সে পূর্ব উনকে কাব্য মেঁ উদ্দামবেগ সে বিদ্রোহী স্বর মুখর হুআ হৈ। উস সময় হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় কাব্য মেঁ বিদ্রোহ কী ইতনী আগ দুসরী জগহ কহীঁ দেখনে কো মিলতী হৈ। বহ যুগধর্ম কী হুংকার বহকর গুঁজ রহে থে। স্বাধীনতা পূর্বকে উনকে কাব্য-রেণুকা, হুংকার, রশ্মিরথী ঔর কুরুক্ষেত্র সভী মেঁ যহ স্বর প্রমুখ হৈ। দিনকরকে ইস বিদ্রোহী রাষ্ট্র কাব্য কী তুলনা বংগলাকে প্রসিদ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম সে কী জা সকতী হৈ। দোনো মেঁ অগ্নিবীণা কী ঝংকার হৈ।"[২] তারপর লেখকদ্বয় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটির সঙ্গে দিনকরের 'আলোকবন্যা' কবিতার তুলনা করেছেন। নজরুলের কাব্যের অন্তরঙ্গ পাঠক সহজেই এই একাত্মতা উপলব্ধি করবেন। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার উদ্ধৃতাংশ :—

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি
আমি পথ সম্মুখে যারা পাই তাই চূর্ণি
• • • •

১। রামধারী সিং দিনকর—মন্মথনাথ গুপ্ত পৃ: ১১- ২
২। দিনকর : সৃষ্টি ঔর দৃষ্টি—সম্পাদনা শ্রীগোপালকৃষ্ণ কৌল এবং শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃ: ১১

মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীমরণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !

আত্ম জাগৃতির এমন অবিমিশ্র ঋজুতা এমন অনবদ্য দৃঢ়তা বাংলা সাহিত্যে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন এনেছিল তার পরিচয় যুগচারনা দিনকরের কাব্যে। প্রাণের কথা এমন রাজকীয় প্রাচুর্যে যে অভিব্যক্ত হতে পারে তা ছিল ইতিপূর্বে অপরিজ্ঞাত। অফান আত্মশক্তির উদ্বোধনের জয়ধ্বনি দিনকরের আলোকবর্ষা কবিতাটির মূল সুর।

কবি বলছেন—

জ্যোতির কবি মৈঁ জলিত সৌরমণ্ডল কা
মেরা শিখণ্ড অভিনাম, কিরীটি অনলকা।
রথ মেঁ প্রকাশ কে অশ্ব ছুটে হৈঁ মেরে,
কিরনেঁ। মেঁ উজলঞ্চিত শুভ্র হৈঁ মেরে।
• • •
মস্তক মেঁ তব অভিমান দিয়া করতা হুঁ
পতনোন্মুখ কো উত্থান দিয়া করতা হুঁ।
• • •
মৈঁ বিভা-পুত্র, জাগরণ গান হৈ মেরা,
জগ কো অক্ষয় আলোক দান হৈ মেরা।

কেবলমাত্র আলোকবর্ষা নয়, হিমালয়, নটীদিল্লী, তাণ্ডব, দিগম্বরী, হাহাকার, বিপথগা অথবা অনলকিরীট যে কোন একটি কবিতা যেন একটি অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি। রেণুকা, হুংকার, কুরুক্ষেত্র, রশ্মিরথী, সামধেনার পর্যায় পর্যন্ত দিনকর কাব্যে এই বিদ্রোহের সুর বারংবার নানারূপ প্রভাবকেই স্মরণ করায়।

উদাহরণস্বরূপ অনলকিরীট কবিতার দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হল—

লেনা অনল-কিরীটি ভালপর ও আশিকে হোনে বালে।
কালকূট পহলে পীলে না, সুধাবীজ বোনে বালে।

আবার যৌবনের জয়ধ্বনি শুনি :—

চল যৌবন উদ্দাম,
চল, চল বিনা বিরাম,
বিজয় মরণ, দোঘাট
অমর কে বীন কহা বিশ্রাম ?

এই জয়যাত্রায় নজরুলের প্রতিধ্বনি :—

চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্বগগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল
চলরে চলরে চল
চল্ চল্ চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল॥

একথা স্মরণীয় যে, নজরুল প্রতিভার পরিচয় কেবলমাত্র তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতায় নয়। এটি তাঁর বহুমুখীন প্রতিভার একাংশ মাত্র। বিদ্রোহী নজরুলকে অতিক্রম করে গেছে প্রেমিক নজরুল, মানবপ্রেমিক নজরুল আর এই মানবপ্রেম তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে ঈশ্বর প্রেমের পরম উপলব্ধিতে। তেমনি দিনকরের পরিচয়ও শুধু ওজস্বী কাব্যে নয়। প্রেমিক দিনকর রসবন্তী, নীলকুসুমের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছেন, মানবপ্রেমিক দিনকরের পরিচয় দিল্লী দীপী ওঁর কাংখ, পরশুরাম কী প্রতীক্ষা, নামকে পদ্মে ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে। ঈশ্বর প্রেমের সার্থক রূপায়ন হয়েছে হায়ে কো হরিনামে—শ্রী অরবিন্দের অধ্যাত্মবোধের পরম উপলব্ধির স্বাধীনতা উত্তরকালেও দিনকরের বিদ্রোহী সুর স্তব্ধ করে নি। এর রূপায়ন এবং রসায়ন হয়েছে ভিন্নস্রোতে।

এতদ্ব্যতীত দিনকর তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ 'অর্ধনারীশ্বর' গ্রন্থের প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে নজরুলের মহৎবাণীকে স্মরণ করেছেন—

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

নজরুল বা দিনকরের বহুমুখীন প্রতিভার বিশদ আলোচনা বা তার উৎস সন্ধান প্রস্তাবিত প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। নজরুল অনুরাগী পাঠক এবং সমালোচকের সামনে এই সত্যটি তুলে ধরা যে, নজরুল কেবল বাঙালীর কবি নন, কেবল বাংলা সাহিত্যে তাঁর অক্ষয় প্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর নেই, বিশাল হিন্দী সাহিত্যেও রেখে গেছেন উজ্জ্বল প্রভাব। বিদগ্ধ কবি দিনকর নজরুল প্রতিভার উত্তরসূরী বললে ভুল হয় না। তবে এই প্রভাব যতটা ভাববস্তুর দিক দিয়ে ততটা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নয়। বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক, গবেষক অনেকেরই হয়তো এই তথ্যটি অপরিজ্ঞাত।

সেদিনের ভারতব্যাপী গণবিক্ষোভে নজরুলের উদাত্ত আহ্বান—

এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে ;
করুণ বেশে
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর।—

বাঙালীর মন জয় করেছিল। তাঁর চির অশান্ত মনের প্রভাবে সৃষ্টিকর্মে কোথাও সৌন্দর্য হানি হয়তো হয়েছে কিন্তু তাঁর দুর্বার আবেগ ও উদ্দীপনা সেদিনের সেই প্রবল স্বাদেশিকতায় যে জোয়ার এনেছিল তা বিস্মৃত

হবার নয়।

প্রদোষ—

যবকী যহী জলন কী বেলা
তো ভী মৈঁ কুছ গাউঁগা
সুরগ যহী যদি মিল যাওকী
অপনা তব ঠাঁ ঔর—

কবি নিজ হৃৎপিণ্ডকেই আঘাত দিয়েছেন।

পরিশেষে একটি কথা কবি ভোজ

কবাইতে পর্যোক্তি করেন—

জিসমেঁ লাভবাদ হৈ দোনোঁ।
আদমে ইনকিলাব হৈ দোনোঁ
দেশমে মেঁ অর্থ হৈ ভরা হৈ
বাকই আফতাব হৈ দোনোঁ।।

একথা আজী নজরুল সম্বন্ধেও অবিসংবাদিত সত্য।

মেঁ লাভবাদ, আদমে ইনকিলাব।

শিবকর ঔর ইনকী কাব্য কৃতির—

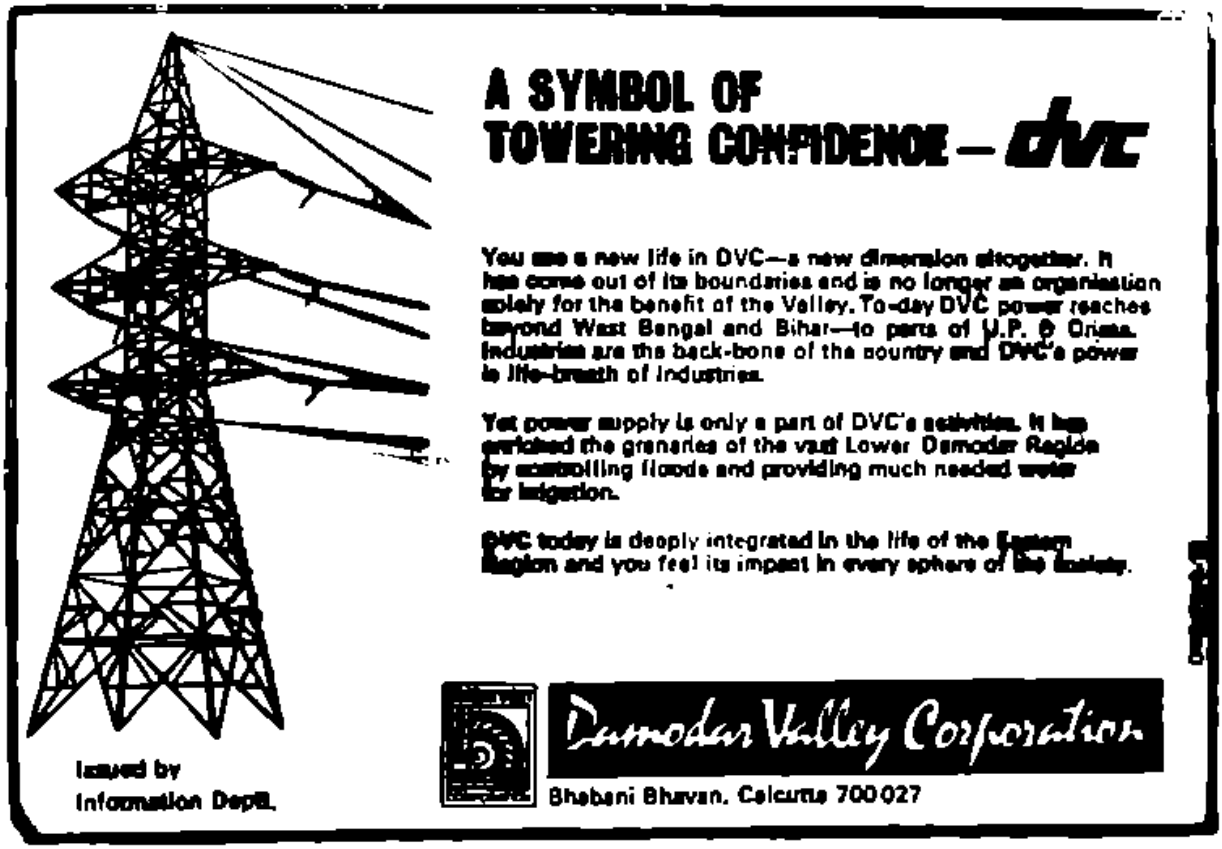

রাজস্থানী লোকসাহিত্য ও বিবাহ সঙ্গীত

জ্যোতির্ময় দাশ

লোকসাহিত্যের পরিধি এবং ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত। অরণ্যবাসীদের আদিম অভিব্যক্তি থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের সীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত সমস্ত অনুভাবনার ফসলকেই লোকসাহিত্যের অন্তর্গত করা যায়। লোকসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাধারন ভাবে শিশু যেমন প্রকৃতির সৃষ্টি এবং বয়স্ক মানুষ যেমন নিজের হস্তকর্তা তেমনি লোকসাহিত্যকে শিশুসাহিত্য বলা যায়—কেননা মানব-মনেই তার স্বতঃস্ফূর্ত জন্ম। যে স্বাভাবিকতা এবং সরলতা লোকসাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তেমনটি অন্য কোথাও পাওয়া দুর্লভ। অনেকটা এই কারনেই লোকসাহিত্য সর্বজন প্রিয় ও কালজয়ী এবং তাকে লোকজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে মানা হয়ে থাকে।

সরলতা এবং স্বাভাবিকতাপূর্ণ আদি মানুষের অভিব্যক্তি এই লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সৃষ্ট নয় বলে এতে গোষ্ঠিগত বা সামুহিক ভাবের ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়। কোন একক রচিয়তার ব্যক্তিত্বের ছাপ তাতে যেমন থাকে না তেমনি কারোর একার অনুভূতি তার পরিচিত অনুমান করতে সক্ষম নয়। লোকসাহিত্য তাই স্রষ্টার ভাবনা সমাজের ভাবনার সাথে একাকার হয়ে মূর্ত হয়ে উঠে।

কোন এক বিশেষ কালের জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তার লোকসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। লোকসাহিত্যে লোকমানস যতটা বিশুদ্ধভাবে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সুরক্ষিত থাকে তেমনটি আর অন্য কোন মাধ্যমের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রাচীন মানব সমাজ যখন আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে ছিল তার সেসময়কার মানসিকতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা এই সাহিত্যের মধ্যেই পেয়ে থাকি। আমাদের অতীত পূর্বসূরীদের মানসিক এবং মানবিক চেতনার পরিচয় পেতে হলে লোকসঙ্গীতের অনুসন্ধান ভিন্ন আমাদের অন্য আর কোন মাধ্যমও খুঁজে পাওয়া শক্ত।

পাশ্চাত্যদেশে লোকসাহিত্যকে নৃ-শাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, ভাষাশাস্ত্র, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান এবং পুরাতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে ধরা হয়ে থাকে। ইউরোপের ছোট বড় সব রাষ্ট্রের নিজস্ব লোকসাহিত্যের পরিষদ আছে এবং গবেষক ও বিজ্ঞানীরা আজও তাতে নিরন্তর গবেষণা এবং অনুসন্ধান করে চলেছেন।

এই জনসাহিত্যের অনেকগুলি ধারা রয়েছে। প্রতিটি ধারার আলাদা আলাদা গুরুত্ব এবং মহত্ব রয়েছে। জনবাসীর কোন অংশই রসহীন নয় কারণ তার পেছনে জনজীবনের সমর্থন থাকে। লোক-কলাকার লোক-সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করেছে। এই রূপের বিভিন্নতার জন্যে সেই সব বিষয়বস্তুর আলাদা আলাদা মূল্যমান রয়েছে।

সাধারণভাবে যে কোন দেশের লোকসাহিত্যকে[১] তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় (ক) লোককথা (খ) লোকোক্তি বা প্রবচন (গ) লোকগীত।

এই তিনটি রূপের মধ্যে লোকগীত অন্যতম এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

They are much nearer the real life than are the folk tales, for these seem to represent and escape from life rather than reproduction from it—(Introduction to Folk songs, Miceal Hills.)

সামগ্রিকভাবে লোকসাহিত্যের সমস্ত ধারাগুলিই প্রেরণাদায়িনী। বিশেষভাবে মহত্বপূর্ণ কারণ এখানে শব্দের সঙ্গে সঙ্গীত মিলে মিশে রয়েছে। মানুষ সঙ্গীতপ্রিয় প্রাণী। রাগ-রাগিনীর সুরলহরীর সঙ্গে হৃদয়ের কোমল অনুভূতির প্রকাশ তার মানসিকতাকে সব থেকে বেশী প্রভাবিত করে। যেমন গানের মাধ্যমে ব্যক্ত ভাবাভিব্যক্ত হৃদয়কে বশীভূত করতে বিশেষ ভাবে সমর্থ তেমনি বিশেষ দুঃখের সময়ে শোকবার্তাও গান রূপেই পাওয়া যায়। এমন কি মৃত্যুর সময়েও অনেক অঞ্চলে স্ত্রীলোকদের মধ্যে গান গেয়ে শোক প্রকাশের প্রথা প্রচলিত আছে। লোকগীত তাই জনসাহিত্যে সব থেকে বেশি প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। লোকগীতের মহত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন—"লোকগীত হী জনতা কী ভাষা হৈ"।

রাজস্থানী লোকগীত এক অর্থে সমুদ্র সমান। তাকে বিষয় এবং প্রকারভেদে শ্রেণীবদ্ধ করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই গীতের বিষয়ের কোন সীমা সংখ্যা নেই এবং প্রকারের বা বিভিন্নতার কোন অন্ত নেই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই সব গানের অগণিত শ্রেণী বিভাগ করা চলে।

(১) প্রাচীন রাজস্থানী সাহিত্যের মূলত দুটি প্রধান রূপ দেখতে পাওয়া যায়। (ক) শাস্ত্রীয় সাহিত্য—যে সাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা শাস্ত্রীয় নিয়ম নীতির সুষ্ঠু আচরণ ও পালনের জন্যে রচিত। (খ) লোক-সাহিত্য—যে সাহিত্য কিংবদন্তীর মত মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা রচিত না হয়ে সময় ও যুগের সাথে সাথে বিভিন্ন জন সম্প্রদায় দ্বারা রচিত এবং পরিমার্জিত হয়ে চলেছে।

অন্য প্রাদেশিক লোকসাহিত্যের সাথে রাজস্থানী লোকসাহিত্যের কিরূপ পার্থক্য আছে। এদেশের লোক সাহিত্য শুধুমাত্র গ্রামীন জনতা বা আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—শহরবাসী শিক্ষিত সংগতিবান সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে! আজও উচ্চকৃষ্টি সম্পন্ন পরিবারের অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান বা পার্বন প্রভৃতি লোকগীত বা লোককথার মাধ্যমে উদযাপিত হয়ে থাকে। রাজস্থানের বিবিধ আচার অনুষ্ঠানে লোকগীতের ব্যবহার প্রায় অনিবার্য। সেদিক থেকে উদ্দেশ্য অনুসারে রাজস্থানী লোকগীতিকে দুটিই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) ধার্মীক লোকগীত—যথা সংস্কার, দেবদেবী ও ব্রত এবং ভক্তিমূলক।

(খ) মনোরঞ্জন মূলক লোকগীত—বিভিন্ন ক্রীড়া, উৎসব, ঋতুবর্ণন এবং মানব জীবনের সরস প্রসঙ্গের লোকগীত।

রাজস্থানী ধার্মিক লোকগীত আবার তিনটি বিষয়রূপে বিভক্ত (ক) সংস্কার সম্বন্ধী গীত (খ) দেবদেবী সম্পর্কিত গীত (গ) ব্রত উপলক্ষে ব্যবহৃত গীত।

ভারতীয় জীবন বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে সুসংস্কৃত বলে মানা হয়ে থাকে। গর্ভাধান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনে শাস্ত্রমতে যে ১৬টি সংস্কারের বিধান আছে সেগুলিই এই ধরনে (১) গর্ভাধান (২) প্রসবন (৩) সীমান্তোন্নয়ন

(৪) জাতকর্ম (৫) নামকরণ (৬) নিষ্ক্রমণ (৭) অন্নপ্রাশন (৮) চূড়াকর্ম (৯) কর্ণবেধ (১০) উপনয়ন (১১) বেদারম্ভ (১২) সমাবর্তন (১৩) বিবাহ (১৪) বানপ্রস্থ (১৫) সন্ন্যাস এবং (১৬) অন্ত্যেষ্টী সংস্কার।

প্রত্যেক সংস্কারের সাংস্কৃতিক মহত্ত্ব আছে। গর্ভাধান থেকে গৃহস্থজীবনে প্রবেশ পর্যন্ত প্রতিটি কাজ মন্ত্রোচ্চারনের সঙ্গে মাঙ্গলিক ধারায় সুসম্পন্ন করে জীবনে, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এর রূপ দেবার প্রয়াস আমাদের সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য। এই সব ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সময় সময় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রমণীদের দ্বারা গীত মধুর সঙ্গীত সংস্কারকে বিশেষ মনোরঞ্জক এবং আনন্দপ্রদ করে তোলে।

এই ১৬টি সংস্কার স্থূলভাবে যে চারটি ব্যবহারিক সংস্কারের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি হল (১) জন্ম (২) উপনয়ন (৩) বিবাহ এবং (৪) মৃত্যু। এরমধ্যে সর্বাধিক গীত বিবাহ প্রসঙ্গে রচিত এবং প্রচলিত।

বিবাহকে মানব জীবনের সব থেকে আনন্দমুখর মুহূর্তে হিসেবে ধরা হয়—দূর দূরান্ত থেকে এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বিবাহ বাসরে সম্মিলিত হয়। উৎসব মুখর পরিবারের সকল স্ত্রী-পুরুষ এই আসরে বিভিন্ন মনোরঞ্জক কাজের মধ্যে নিজেদের উৎসাহ এবং আনন্দকে নানান ভাবে প্রকাশ করে থাকে। স্ত্রী লোকেরা তাদের মনের উচ্ছ্বাস ও আনন্দময়তা এই উপলক্ষে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। বিবাহের বিভিন্ন লোকাচারকে কেন্দ্র করে রচিত লোকগীত গেয়ে তারা গৃহকে এক আনন্দমুখর রঙ্গমঞ্চ করে তোলে।

রাজস্থানে বিবাহের দশ দিন আগে থেকে তার শেষ হবার পরের কয়েকদিন পর্যন্ত নানান ধরণের মাঙ্গলিক রীতি রেওয়াজ পালন করা হয়। সমস্ত রীতি বা লোকাচার প্রসঙ্গেই আলাদা আলাদা লোকগীতি রয়েছে—যার মধ্যে রাজস্থানী নারী হৃদয়ের আমোদপ্রিয়তা, রসিকতাবোধ, সৌন্দর্যময়তা এবং কাব্যপ্রীতির মহত্ত্বপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব আমরা এই সব মঙ্গল-গানের মধ্যেই খুঁজে পেতে পারি অনায়াসে।

কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষের বিবাহগীতের প্রকারভেদ রয়েছে। বরপক্ষের থেকে কন্যাপক্ষের গীতের বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশি কারণ বিবাহের বেশির ভাগ সংস্কারই কন্যাপক্ষকে সুসম্পন্ন করতে হয়। বরপক্ষের গানের প্রকারভেদ কম হলেও গানের সংখ্যা কিছু কম নয় কারণ একই বিষয়ের সামান্য পরিবর্তন নিয়ে অনেক গান পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বিবাহের রীতি রেওয়াজ অনুসরণ করে বিবাহগীতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:—

(১) বিবাহরত্নের সাধারণ গীত—যার অধিকাংশই বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়েই বিয়ের আগে বিভিন্ন সময়ে গেয়ে থাকে। (২) কন্যাপক্ষের গীতি এবং (৩) বরপক্ষের গীত।

সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান "সগাই"-এর (সম্বন্ধ নিশ্চয়) মাধ্যমে দুপক্ষের মধ্যে বিবাহ স্থির-নিশ্চিত এবং 'লগন' (শুভদিন) নির্ধারণ করা হয়। এবং এর পরেই বিবাহ-উৎসবের শুভারম্ভ "বিনায়ক গীত" (গনেশ বন্দনা) দিয়ে শুরু করা হয়। বিয়ের আট দশ দিন আগে 'বিনায়ক' স্থাপন করে গণেশকে আবাহন করা হয় এবং পূজা করা হয়। এই উপলক্ষে বর এবং বধূ উভয় পক্ষই যে লোকগীত গেয়ে থাকে তা এই ধরণের :—

পূরব দিশা মেঁ সূর্যদেবজী সমরথ জী/হাঁজী দেবা সহস কিরণ লে উগসী ।/
মালিক তুম বিন ঔর নহীঁ আসী/বেগণধারো গোরা কা গণপতজী ।/
পচ্ছিম দিশা মেঁ চাঁদ দেবা সমরথজী : /হাঁজী দেবা মৌ লাখ তারা লাসী ।/

বেগা পধারো গোরা কাগণপতজী। /কৈলাস পুরীমে সদা শিবজী সমরথ।
ঈ জী দেবা চুড়িয়াঁ নাত্যা লাঁত্যা লাসী : /বেগা পধারো বাণী গোরা কা গণপতজী।

[পূর্ব দিগন্তে সূর্য দেবতা পূর্ণ শক্তিকে বিরাজমান। তিনি সহস্র কিরণে উদিত হবেন। প্রভু তুমি ভিন্ন অন্য কেউ যেন না আসে। গৌরী পুত্র গণেশজী আপনি ত্বরা করে আসুন। পশ্চিম দিগন্তে চন্দ্র দেবতা পূর্ণ শক্তিতে বিরাজমান। তিনি নয় লক্ষ উজ্জ্বল তারকা সাথে নিয়ে আসবেন। কৈলাসপুরীতে শিব সর্বদাই পূর্ণ-শক্তিতে বিরাজিত, তিনি সাথে ভূত প্রেত নিয়ে আসবেন। গৌরী পুত্র শ্রীগণেশজী আপনি অনুগ্রহ করে শীঘ্র আসুন।]

বিনায়কে অন্য এক গীতে (গণপতি সংস্করণে) কন্যার সৌভাগ্যের জন্যে তার বাপের বাড়ী এবং শ্বশুর-বাড়ীর ধনবৃদ্ধির এবং সমৃদ্ধির প্রার্থনা করা হয়েছে। অন্য দেবদেবীদের নিয়ে রচিত গীতকে 'বিহাণ' বা 'ঝালর' বলে। 'ঝালর' মানে আরতি। প্রত্যেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই দেবতাকে আহ্বান জানাতে আরতি করার বিশেষ প্রয়োজন। দেবদেবীকে সম্বোধন করে এই উপলক্ষে যে সমস্ত গান গাওয়া হয়ে থাকে সেগুলিকে 'ঝালর' বলা হয়।

গণেশ পূজার পর ভাবী বধূর গৃহে যে লোকগীত গাওয়া হয়ে থাকে তার নাম 'বনড়ে'। বারাত-বরাতী (বরযাত্রী ও সঙ্গীসাথীরা) কেমন হবে তার বর্ণনায় এই লোকগীত রচিত 'বনড়ে' এই চুলহা (বর) :—

সিরদার বনাজী হস্তী থে লাইজো হে কজলী দেসরা/উমরাব বনাজী ঘুড়লা থে
লাইজো হে খুরসানী দেসরা/সিরদার বনাজী দেবরিয়ে ঝলকে ও আভা বীজলী/
উমরাব বনাজী সোনো থে লাইজো হে লঙ্কাগড় দেসরো/উমরাব বনাজী
রূপো থে লাইজো হে উমলপুর দেস রো।

[হে বীর বনাজী (বর) আপনি বরযাত্রার জন্য কাজলী দেশ থেকে হাতী আনবেন। হে আমীর বনাজী আপনি ঘোড়া খুরসানী দেশ থেকে আনবেন। হে বীর বনাজী আপনার মুখে ফুলের ঝালর এমন ঝকমক করছে যে মনে হচ্ছে আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। হে আমীর বনাজী আপনি লঙ্কাদেশ থেকে সোনা আনবেন আর রূপা আনবেন উমলপুর থেকে।]

'বনড়ে' উপলক্ষে রচিত অন্য এক গানে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল দিক ফুটে উঠতে দেখি—দাতা মনে দম্ভের বিন্দুমাত্র ভাবনা পোষন করার বদলে বিনম্রতায় নত হয়ে থাকে। কন্যাদানকারী কন্যার পিতা সর্বদাই বরপক্ষের থেকে নিজেকে ছোট মনে করে থাকে এবং গানেতে যত্রতত্র তার প্রকাশ দেখা যায়। অন্য আর একটি গানে দেখা যায় কন্যা তার পিতা ও অন্য গুরুজনদের সম্বোধন করে বলে—"বাবা আমাকে মাড়বার দেশে বিয়ে দিও না, তার বদলে যদি আমি কুমারী থেকে যাই তো সেও ভাল, সেখানে সারদিন হাতে জলের পাত্র আর মাথায় জলের ঘড়া রাখতে হবে, জল বইতে বইতেই জীবন কেটে যাবে।" নিজের পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে কন্যার বিচক্ষণ মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থেকে একটা কথা ধারণা করা যেতে পারে যে অতীত রাজস্থানে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। কোন অল্পবয়স্ক বালিকার পক্ষে এ ধরণের কথা বলা সম্ভব নয়।

'বনড়ে' গীতের পর আমরা বিবাহের অন্যান্য লোকাচার বা স্ত্রী আচারের কিছু পরিচয় পাই। তার মধ্যে বর-বধূকে 'তেল চঢানা' 'পীঠী' ইত্যাদি রয়েছে। এই সময় 'উবটন' (এক ধরণের প্রলেপ দিয়ে বর-কনের শরীর মার্জনা করে স্নান করানো হয়ে থাকে—অনেকটা আমাদের গায়ে হলুদের মতই। উবটনকে রাজস্থানের

বহুস্থানে 'পীঠী' বলে। আটা, হলুদ তেল প্রভৃতি দিয়ে 'পীঠী' তৈরী করা হয়। এবং এক বিশেষ লোকগীত গাইতে গাইতে নাপিত বা নাপিতানী বর-বধূকে স্নান করিয়ে থাকে। গানটি এই ধরণের :—

সহঁ এ চিঁ। রো উবটনো, মায় চামেলী রো তেল/অব লাড়ো বৈঠো উবটনৈ
আও ছারী দাস্তঁ। নিরখ লো, আও ছারী মায়ঁ। নিরখ লো খঁ।/নিরখঁ।।
সুখ হোয়, অব লাড়ো বৈঠো উবটনৈ/তো কর লাড়া উবটনো, থারা
উবটণঁ। মে বাস ঘনী/থারী দাস্তঁ। গজোরো উবটনো, থারী মায়ঁ।
গজোরা উবটনো/কোঈ তেল ফুলেল চম্পেল ঘনী, চম্পারী কলিয়ঁ।
সুগন্ধ ঘনী/লাড়া রা মন মেঁ খাঁত ঘনী।

[গমের আটা আর ছোলার ছাতুতে চামেলী ফুলের তেল দিয়ে এই 'উবটন' তৈরী হয়েছে, এবার আমাদের আদরের সোনামণি 'উবটনা' করতে বোস। ও ঠাকুমা দিদিমা তোমরা আমাকে দেখো, মা তুমিও এসে দেখো একবার। তোমাদের আদরের মণি এবার উবটনা করতে বসেছে। তোমরা সকলে এসময়ে তাকে দেখলে তার শুভ (মঙ্গল) হবে। সোনামণি এবার উবটনা সুরু কর। তোমার উবটনেতে অনেক রকমের সুগন্ধী মেশানো আছে : তোমার ঠাকুমা, মা সকলে মিলে এই উবটন তৈরী করেছে। তেল আতর আর চাপারে সুগন্ধে ভরপুর। চম্পার কলিতে প্রচুর সুগন্ধ রয়েছে আমাদের সোনামণির মনেতে অনেক ভালবাসা আছে।]

এই 'পীঠী' বা 'উবটনার' সময়ে বর-কনেকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কিও যথেষ্ট হয়ে থাকে। বিশেষ করে বৌদি, কাকী, পিসী, মামীরা হাসি মস্করার গান গেয়ে আনন্দ করে। এই পর্যায়ের কিছু গানে আদিরসখচিত অশ্লীলতার-ও পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় গানের মধ্যে গায়িকা পাত্র পাত্রীর মান মর্যাদা অনুযায়ী দুচারটি বাড়তি শব্দ নিজের থেকে যোগ করে দেয়—উদ্দেশ্য হাসি আনন্দের মাত্রা কিছু বেশি বাড়িয়ে তোলা। তেমন একটি গান :

চাঁপলেরী চোসঠ কলিয়ঁ। এ/বনো পুরে বনী বী রলিয়ঁ। এ/বনড়ে রে হাত
পতাসা এ/বনো করৈ বনী সুঁ তমাসা এ/বনড়ে রে হাথ মেঁ ডোরী এ
বনড়ে সুঁ বনড়ী গোরী এ/বনড়ে রে হাথ মে কুঁচী এ/বনড়ে সুঁ বনড়ী উঁচী এ।

[চাপার চৌষট্টি কলি বর কনের সব ইচ্ছে পূরণ করছে। বরের হাতে রয়েছে বাতাসা, বর কনের সাথে করছে তামাসা। বরের হাতে রয়েছে দড়ি, কনে আমাদের বরের থেকে বর্ণা বেশি। বরের হাতে কাঁতি রয়েছে—বরের থেকে কনে মাথায় লম্বা অনেক।]

বিয়ের আগে বর ও কনের আত্মীয় স্বজনকে পরস্পর নিমন্ত্রণ করে ভোজন করানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে রাজস্থানে। অনেকটা আমাদের পাকা দেখার মতই হয়ত। ভোজনের পর ফেরার পথে লোকগীতি গাইবার রীতি রয়েছে তার নাম 'বনৌলা'। গানের চেহারা হল :

ঝির ঝির ঝির ঝির মেহবো বরসে বোতীড়া ঝড় লাগা/ছেঁ খানে পুই,
কুঁবর লাডলা, থারো বিনৌলো কুণ ছোত্যো ?/ঈসর ঘর বহু গোরা,
থারো বিনৌলা উণ ছোত্যো/সুরজ ঘর বহু রোহনী, থারো বিনৌলা
উণ ছোত্যো/ঘর সে তো লাড়ো পগ পগ আরো, ঘুড়লে চঢ় পহঁচারো/
থে চির জীবো দেবী দেবতা কা আরা, তলী এ সুগত পহঁচারা/লাখী সী
ভাঁড়ি কী ঝবরক দিওলো, উপর লাল চন্দোবো।

[ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। যেন মুক্তো ঝরে পড়ছে। হে রাজকুমার তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস

করি তোমার 'বনৌলার' নিমন্ত্রণ কার ওখানে ছিল ? ঈশ্বরজীর বাড়ীতে গৌরাঙ্গী কনে আছে—আমার বনৌলার নিমন্ত্রণ তাঁর কাছেই ছিল। সোনা আমাদের বাড়ীতে পায়ে হেঁটে এসেছে এতটা পথ, তাকে ঘোড়ার পিঠে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে—চিরজীবী পুত্রকে দেব দেবীরা সকলে সযত্নে পৌঁছে দিয়েছে। লম্বা দণ্ডের মত উজ্জ্বল দীপক জ্বলছে এবং মাথার ওপরে লাল চাঁদোয়া টাঙানো।]

বিবাহের আগের দিনের রাত্রিকে 'মেহেন্দী কি রাত' বলে। এই রাত্রে বর-বধূর হাতে 'মেহেন্দীর' আলপনা লাগান হয়। রাজস্থানী রমনীরা যে কোন উৎসবে বা পালা পার্বনে হাতে মেহেন্দী লাগিয়ে থাকে। মেহেন্দীর আলপনা স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যের (সধবা অবস্থার) চিহ্ন এবং মেহেন্দীর গাঢ় রাঙানী রঙকে দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক বলে ধরা হয়—সুতরাং বিবাহ উপলক্ষে বর কণের মাসী, পিসী, মামী, বৌদি, কাকী প্রভৃতিরা হাসি আনন্দের উচ্ছলতায় গান গাইতে গাইতে 'মেহেন্দী' লাগিয়ে থাকে। এই গানেতে 'মেহেন্দী' তৈরী করার ধারাবাহিক রীতি ব্যাখ্যা করার পর মেয়েতে যারা মেহেন্দী লাগাচ্ছে তারা নিজেদের মনের ভাবনা প্রকাশ করে বলে—হে (বর) স্বামী, তোমার এই মেহেন্দীর জন্য আমি সব সমর্পণ করতে পারি, এর জন্যে হীরে জহরত পর্যন্ত ত্যাগ করতে দ্বিধা নেই আমার।

বর যাত্রার জন্যে রওনা হবার সময় বর প্রথামত সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে। সে সময় আত্মীয়রা ঘোড়া এবং বর দুজনেরই মাঙ্গলিক আরতি করে থাকে। এই আরতির সময় যে গান গাওয়া হয় সেটি এই ধরণের :

ঘোড়ী পগ মোড়ে ঝাঁঝর বাজে/ঘোড়ী গঈ অ জোসীড়ারী হাট,
বারী জাউঁ ও নারাণ গঢ়রো সেবরো/ছোড়ো ছোড়ো দাদাজী মুহারো সেবরো/
ছোড়ো ছোড়ো কাকাজী মুহারা সেবরো/মুহানে পরণবা বী আই ও হুঁস/
ঘোড়ী পগ মোড়ে ঝাঁঝর বাজে/ঘোড়ী গঈ বজাজরী হাট, বারী জাউঁ
ও নারাণগঢ়রো সেবরো/মুহানে আঈ হো পরণবা বী হুঁস/ঘোড়ী পগ
মোড়ে ঝাঁঝর বাজে/ঘোড়ী গঈ ননদোইজী বী হাট, বারী জাউঁ ও নারাণগঢ়রো
সেবরো/ছোড়ো ছোড়ো মাসাজী মুহারা সেবরো/মুহানে পরণবা বী আঈ
ও হুঁস/ঘোড়ী পগ মোড়ে ঝাঁঝর বাজে, বারী জাউঁ ও নারাণগঢ়রো সেবরে।

[ঘোড়ী• (ঘোটকী) মাটিতে পা ফেললে খঞ্জনী বেজে ওঠে। ঘোড়ী জোসীদের বাজারে গেছে—আহা নারায়ণগড়ের 'সেবরার (বরের মুখ আচ্ছাদিত করে রাখার জন্য ফুলের মালার জালর সহ মুকুট) তুলনা হয় না। ঠাকুর্দা আমার মুকুট ছেড়ে দাও, আমার এখন বিয়ের উৎসাহ জেগেছে। ঘোড়ী পা ফেললে খঞ্জনী বেজে ওঠে। ঘোড়ী বাজাজের বাজারে গেছে। আহা নারায়ণগড়ের 'সেবরা' বলিহারী বটে। মামা আমার মুকুট ছেড়ে দাও। আমার বিয়ে করার সখ জেগেছে। ঘোড়ী পা ফেললে খঞ্জনী বেজে ওঠে। ঘোড়ী ননদাইয়ের বাজারে গেছে। নারায়ণগড়ের মুকুটের কোন তুলনা হয় না। ও মেসোমশাই আমার মুকুট ছেড়ে দাও, আমার এখন বিয়ের বাসনা হয়েছে। ঘোড়ী পা ফেললে খঞ্জনী বেজে ওঠে। নারায়ণ গড়ের মুকুটের সত্যিই কোন জবাব নেই।]

বর এবং বরযাত্রীর দল কনের বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছলে বর তলোয়ার এবং গাছের ডাল দিয়ে তোরণ স্পর্শ করে অভিবাদন করে। কনের মা সে সময় জামাইকে মঙ্গলারতি করে বিবাহ মণ্ডপে আহ্বান জানায়। এই

• বরযাত্রার জন্য কেবলমাত্র মাদী ঘোড়া ব্যবহার করা হয়—এবং এদেশে তাকে 'ঘোড়ী' বলে।

সময় যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তার নাম 'আরতা বীন্ধ কী ছিবকী'—গানের মুখ্য বিষয় হল বিশ্বরাজার যশ কীর্তন এবং তার বৈভবের গুণ কীর্তন করে কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্তিতে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে কন্যার সুখ সৌভাগ্য প্রার্থনা করা। কন্যার সখি-বান্ধবীরা এই সময়ে "কামন" (বশীকরণ) গান গেয়ে থাকে। কামনের অর্থ হল 'বশীকরণ' করা। প্রেমের মায়াবী শক্তিতে কন্যা যেন বরকে জীবনভোর বশীকরণ করে রাখতে পারে তার জন্যে এই গান গাইবার রীতি প্রচলিত। কোথাও কোথাও তুক-তাক করে নানান জিনিষ বরের গায়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়—বরের বন্ধুরা চাল দিয়ে তা রুখতে চেষ্টা করে যাতে বর যেন বশীকরণের মায়াজালে না জড়িয়ে পড়ে। 'তোরণ' উপলক্ষে প্রচলিত লোকগীত হল :

তোরণ সে আয়া রাঈবর থর থর কাঁপা রাজ/বুঝা সিরদার বনী মে.
কাঁমন কুণ করয়া হৈ রাজ/মেঁই নহী জাঁণা, মুহারা খাতী কামণগারা
রাজ/খাতী কো নেগ চুকাস্তা, কাঁমণ চীলা ছোড়ো রাজ/ছোড়া
না ছুটে রাঈবর করড়া দুল্যা হৈ রাজ।

[রাজা আমাদের তোরণ স্পর্শ করতে এসেছে—সে থর থর করে কাঁপছে। সর্দার কনেকে জিজ্ঞাসা করে—হে প্রিয়া, কে আমাকে বশীকরণ করেছে। আমি কিছু জানিনা প্রিয়তম, আমাদের কাঠের কারীগর (খাতী) বশীকরণ করে থাকবে। তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে এই বশীকরণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে এসো প্রিয়তম! এ নাগপাশ ছাড়ালেও ছাড়ে না। মহারাজ এতো আরো বেশি জট পাকিয়ে গিয়েছে।]

এরপর বরকনেকে 'চঁবরী'তে (বিবাহ বস্ত্র মণ্ডপে) নিয়ে আসা হয়। প্রথমে বরের ডানপাশে বধূকে বসানো হয়ে থাকে। 'হাতলের' (পাণিগ্রহণ) উপলক্ষে পুরোহিত অগ্নিতে আহুতি দিতে দিতে বরবধূর হাত মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে একত্রিত করে দেন। রাজস্থানে অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ বন্ধনকে পরিক্রমার সাতপাকের পরিবর্তে কোন কোন অঞ্চলে চার পাকের রীতিও প্রচলিত আছে। এই উপলক্ষের লোকগীত হল 'ফেরা' (পরিক্রমা)। একটি গান এই ধরণের :

পৈ লো ফেরো লে মুহারী লাড়ো বাঈ দাদোসা নে লাডলী/দূজো ফেরোলে
মুহারী লাড়ো বাঈ বাবোসা নে লাডলী/আসলো ফেরো লে মুহারী
লাড়ো বাঈ বীরোসা নে লাডলী/চোথো ফেরো লিয়ো মুহারী লাড়ো হোই এ
পরাঈ/হলবী হলবী চাল মুহারী লাড়ো হঁসেলা সহেলিয়াঁ!

[ঠাকুর্দার আদরের ধন আমাদের প্রিয় কন্যা, এবার প্রথম পাক পরিক্রমা কর। বাবার নয়নের মণি আমাদের আদরের কন্যা এবার দ্বিতীয় পাক দাও। ভাইয়ের আদরের বোন আমাদের সকলের ভালবাসার পাত্রী মেয়ে তুমি এবার তৃতীয় পাক ঘুরে এসো। আমাদের আদরের কন্যা চতুর্থ পরিক্রমা শেষ করেছে—এবার সে আমাদের পর হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে চলো সোনা মেয়ে, নইলে তোমার সখিরা সকলে হাসবে।]

যেখানে সপ্তপদীর রীতি প্রচলিত আছে সেখানে এইভাবেই ছটি পাকের পরিক্রমায় ঠাকুর্দা, বাবা, কাকা, ভাই প্রভৃতি পিতৃপরিবারের সদস্যদের আদরের ধন বলে সম্বোধন করার পর সাতপাকের সময় পর হয়ে গেল বলা হয়। অন্যথায় সাধারণভাবে চতুর্থ পাকের পরই কন্যাদান সুসম্পন্ন হয়ে কন্যা স্বামীর বংশের সদস্যা হয়ে যায়। চতুর্থ পরিক্রমার পরেই কন্যার ভাই এবং পরে পুরোহিত বর কনেকে জানায় যে তারা স্বামী-স্ত্রী পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে এবং স্ত্রীকে স্বামীর বাঁদিকে আসন গ্রহণ করতে বলে। বিবাহ সংস্কার পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কন্যার স্ত্রীহিসেবে পতির বাঁদিকে বসার অধিকার থাকে না।

'মায়রা বা ভাত ভরনা' রাজস্থানী বিবাহের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় আচার। সন্তানের বিয়ের সময় মা নিজের বাপের বাড়ীতে বথারীতি নিমন্ত্রণ পাঠায়। সেই নিমন্ত্রণ পেয়ে তার ভাই এবং অন্যেরা (অর্থাৎ পাত্র পাত্রীর মামা, দাদামশাই প্রভৃতি) নিজেদের আর্থিক অবস্থা অনুসারে বোনকে যে উপহার পাঠায় তাকে 'মায়রা বা ভাত ভরনা' বলা হয়। এই উপলক্ষে প্রচলিত গান 'মায়রে' নামে বিখ্যাত।

ভাইয়ের পাঠানো সেই উপহার বোনের কাছে যে কি অপরিসীম মূল্যবান ও বরণীয় তার চিত্র আমরা পাই 'চুনড়ী' গানে। এ জগতে ভাই বোনের মহৎ ও পবিত্র প্রেমের নিদর্শন বিরল। সংসারের বিবিধ জ্বালাযন্ত্রণাময় গ্লানিকর জীবনযাত্রার মধ্যেও কোন এক নিভৃত কোনে ভাই বোনের নির্মোহ প্রেমের এক উজ্জ্বল দীপশিখা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে— যার স্নিগ্ধ আলোয় জীবনের বহু তিক্ত অবসর সুখময় হয়ে ওঠে। বিবাহ উৎসবে গীত 'মায়রে' বা "চুনড়ী" গানে মূলত এই পবিত্র অনুভাবনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে উল্লিখিত 'মায়রে' গানেতে আমরা দেখি উপহার নিয়ে ভাই উপস্থিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বোনকে তার শাশুড়ী ননদ দেবর প্রভৃতি বাঙ্গ বিদ্রূপে বিব্রত করতে থাকে। ভাই ভাই এসে পৌছানর পর বোন আর চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। নিজের ভাইয়ের জন্যে সে গর্ব অনুভব করে। ভাইকে জানায়:

বীরারে মৃহারে চোরটে নে পৈরারো, চোরাসী সরারো মায়রে পোরাতও পহলী
মৃহারে সেরিয়া মেঁ পাড়োসী সরারো মায়রো/বীরা ও পহলী মায়রে সাসুজী
নে পেরাও/সুসরাজী সরারো মায়রো/বীরা ও পহলী-মৃহারা জেঠানীনে পেরাও/
জেঠসা সরারো মায়রো/বীরা ও পহেলী মৃহারী দৌরানী নে পহরাও/দেবরসা
সরারো মায়রো/বীরা ও পহলী মৃহারী নণদল নে পহরাতিও/নণদোঈ সা সরারো
মায়রো/বীরা ও পহলী মৃহারী বহিনঁ নে পেরাও/বেনোইসলা সরারো মায়রো/
বাঈসেল মৃহারী বেন, বাঁয়ড়লো পসার/বাঈ গরবী গরবী, কে থারে
পুতড়ালা রো রাজ ? /কে থারে ধন কো গরবো ? বীরা ও পুত্র পরমেশ্বর কো
মাল/ধন কো কই গরবো ? বাঈ এমল মৃহারী বাঁয়ড়লী পসার/
ভাঈনরো ভায়া আব মিলিয়ো।

[ও ভাই, 'মায়রের' উপহার আগে গ্রামের সকলকে পরাও—মহল্লার সকলে এর প্রশংসা করেছে। হেভাই, মায়রের কাপড়-চোপড় আগে প্রতিবেশীদের পরাও—প্রতিবেশীরা মায়রের প্রশংসা করেছে..... (এই ভাবে গানেতে শাশুড়ী, বড়জা, ছোটজা, ননদকে মায়রের বস্ত্র সম্ভার পরিধান করানোর পর বলা হয়েছে.....) হে ভাই এবার তুমি তোমার বোনকে মায়রে পরাও—তোমার ভগিপতি এর খুব প্রশংসা করেছে। বোন ! তুমি দুহাত প্রসারিত করে ভাইয়ের সাথে মিলিত হও। বোন তোমার কিসের এত গর্ব ! তোমার ছেলের রাজত্ব চলছে নাকি ? নাকি ধনের জন্যে তোমার অহঙ্কার রয়েছে। হে ভাই, পুত্র তো ঈশ্বর-ধন—আর অর্থের জন্যে কে আর মিথ্যে গর্ব করে ? হে বোন, হাত প্রসারিত করে আলিঙ্গন কুরো। মায়ের পেটের আপন ভাই এবার মিলিত হল।]

বিবাহের দিন থেকে নববধূর বিদায় পর্যন্ত কন্যাপক্ষের গৃহে বরযাত্রীদের চারটি প্রধাগত ভোজনের আয়োজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ভোজনের সময় কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকেরা তাদের মনভরে বরপক্ষকে নানান ধরণের ঠাট্টা ও চিটকারীর মাধ্যমে আনন্দমুখর গান গেয়ে থাকে। বিবাহ সংস্কারের আগে বরযাত্রীরা যে খাওয়া দাওয়া করে তাকে 'কুঁবারী জান জীমনা' বলে। তিল দিয়ে তৈরী লাপসী এই ভোজনের একটি প্রধান পদ এবং ঘুরা চিনি ও ঘি দিয়ে তা খাওয়া হয়, এই ভোজনে লবণ ব্যবহার করা হয় না। পরের

দিন সকালে যে ভোজন হয় তার নাম—'পরণী জান', এবং এর তেমন বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। সেদিন বিকেলে যে ভোজের আয়োজন থাকে তাকে 'বড়ী জান' বলা হয়—নানান সুখাদ্য ব্যঞ্জন ও মিষ্টির বিশেষ ব্যবস্থা থাকে এতে। আহারের সময় রমণীরা 'ভাত বন্ধনের' গীত গেয়ে থাকে—গানেতে বরের মা-বাবা এবং অন্য সম্বন্ধীদের বন্ধন বা রোধ করার ইঙ্গিতসূচক উপহাস করে গান গায়। তখন বরপক্ষের পণ্ডিত কিংবা অন্য কোন প্রতিনিধি 'বন্ধী ভাত'কে মুক্ত করে বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সুখ্যাতি করে বরযাত্রীদের ভোজন করতে অনুমতি দেয়। কন্যাপক্ষের পণ্ডিত বা কোন আত্মীয় তাঁর মুখে একটি গোটা লাড্ডু (মিঠাই) পুরে দেবার পর প্রাথমিক লোকাচার শেষ হয় এবং বরযাত্রীরা ভোজন শুরু করে। সে সময়ের গানকে 'তম্বোলন' বলা হয়।

চতুর্থ ভোজনটিকে 'মুকলানী' বলে—এতে কেবল নিকট আত্মীয়দেরই নিমন্ত্রণ করা হয়—বাইরের বর-যাত্রীদের ডাকা হয় না। এই চারিটি ভোজের মধ্যে একটিকে কন্যার দাদামশাই বা মামাদের পক্ষ থেকে দেওয়ার রীতি আছে। এই ভাবেই দেখা যায় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রথাগত ভোজনের ক্ষেত্রেও লোকগীতের মাধ্যমে হাস্য রসের আনন্দ উল্লাসের চমৎকার আয়োজন রয়েছে।

কন্যা সম্প্রদানের পর এবার কন্যাকে বিদায় জানানোর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। ভারতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার এই বিদায়ের ক্ষণটি বড়ই করুণ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারনা করে। রাজস্থানী লোকগীতিতেও সেই করুণ রসের স্রোতটি প্রবাহিত হতে দেখা যায়। বিদায়ের গীতগুলিতে প্রধানত মা, পিসী, ঠাকুমা প্রভৃতিদের কন্যাবিয়োগ বিলাপ-ক্রন্দন করতে যেমন শোনা যায় তেমনি কিছু কিছু গানে কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া হয় নতুন বাড়ীতে সে যেন সব কিছুকে মানিয়ে নিয়ে চলতে এবং সকলের প্রিয় পাত্রী হবার চেষ্টা করে। অন্য আর কিছু গানে জামাতা এবং সম্বন্ধীদের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকে যেন কন্যার ছোট খাট ভুল ত্রুটি মাপ করে তারা যেন তাকে আপন করে নেবার চেষ্টা করে।

বিশ্ববন্দিত কবি কালিদাসের মহাকাব্যে শকুন্তলার বিদায় লগ্নে সর্ব ত্যাগী মহর্ষি কণ্বের আসন্ন বিরহ বেদনায় যে মর্মস্পর্শী দৃশ্যটি আমরা পেয়েছি রাজস্থানী লোকসাহিত্যের 'বিদাই' (বিদায়) এবং অলু (স্মৃতি) পর্যায়ের গীতে তার সমধর্মী চিত্র খুঁজে পাই। অবশ্য কালিদাসের ভাবা সম্পদের পরিশীলিত ও মার্জিত রূপটি আশা করা অন্যায় হবে এ ক্ষেত্রে। ঋষি কণ্ব ব্যথিত কণ্ঠে শকুন্তলাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তপবনের এই তরুলতাদের কে জল সিঞ্চনে স্নেহসিক্ত করবে? বিশাল বনরাজিমালার পত্র-পুষ্প এবং পশুপক্ষী সেই তাপস কন্যার বিদায় লগ্নে চোখের জল ফেলেছিল। আলোচ্য লোকগীতগুলির ভাবসম্পদ এতই করুণ যে গায়ক এবং শ্রোতা উভয়েরই চোখের জলের ধারা বাধ মানতে চায় না। সে সময়ের আবহাওয়াই এমন আর্দ্র-স্তবনীয় হয়ে ওঠে যে কন্যা মা-বাবা ভাই বোন এবং সখিদের কণ্ঠলগ্না হয়ে কাঁদতে থাকে। একটি প্রসিদ্ধ গান এই ধরণের :

ম্হে থাঁনে পুছা ম্হারী ঘীবড়ী/ম্হে থাঁনে পুছা ম্হারী বালকী/ইভরো
বাবৈজী রো লাড় ছোড় র বাই সিধ চল্যা ?/ম্হে রমতী বাবী সোরী পেল/
আরো সগেজী রো সুবটো গারড়মল লে চাল্যো/ম্হে থাঁনে পুছা
ম্হারী ঘীবড়ী/ইভরো মাউজী রো লাড় ছোড় র বাই সিধ চাল্যা ?

[ওরে আমার লক্ষ্মী মেয়ে, আমার দুলালী আমি তোকেই জিজ্ঞেস করছি—বাবার এমন ভালবাসা আদর ছেড়ে তুই কোথায় যাচ্ছিস ? আমি বাপের বাড়ীর সদরে খেলা করছিলাম এমন সময় সম্বন্ধীর ছেলে এসে আমাকে ভিনদেশে (শ্বশুর বাড়ী) নিয়ে গেল। আমি তোকে জিজ্ঞেস করি আমার সোনামণি মায়ের এমন আদর যত্ন ফেলে তুই কোথায় যাচ্ছিস ?]

কোকিল যেমন চলে গেলে নিকুঞ্জবন 'বসন্তের মাধুরীহীন' হয়ে যায় তেমনি প্রেমভালবাসায় লালিত প্রিয় কন্যা পতিগৃহে চলে গেলে পিতৃগৃহ বিষাদ মুক্তভায় হাহাকার করতে থাকে। তার পরিবারের আত্মীয় স্বজন এবং সখিরা উন্মনা হয়ে যায়। উদ্ধৃত গীতটিতে সদ্যবিবাহিত কন্যাকে উপবনের বিদায়ী কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে :—

বনখণ্ড রী এ কোয়ল, বনখণ্ড ছোড় কঠৈ চালী ? /থারী আলে-দিবালে গুড়িয়া ঘরী ?/
বনখণ্ড রী এ কোয়ল, বনখণ্ড ছোড় কঠৈ চালী ? /থারী সাথ সহেলঁ্যা উপমনী/
বনখণ্ড রী এ কোয়ল, বনখণ্ড ছোড় কঠৈ চালী ? /থারী মাউজী থারে বিন উপবণ/
থারী ছোটী বৈনড় রোবে অকেলড়ী/বনখণ্ড রী এ কোয়ল, বনখণ্ড ছোড় কঠৈ চালী/
থারী বীরো সা ফিরে ছৈ উদাস/বিলখত থারী ভাবজনী/বনখণ্ডরী এ কোয়ল,
বনখণ্ড ছোড় কঠৈ চালী ?'

[ও উপবনের কোকিল, উপবন ছেড়ে তুই কোথায় চলেছিস ? কুলঙ্গীতে তোর পুতুল গুলো সব পড়ে আছে। ও উপবনের কোকিল, উপবন ছেড়ে তুই কোথায় চলেছিস ? তোর সাথী সখিরা উদাসী হয়ে আছে···তোর মা তোকে ছেড়ে বিষণ্ণ মনে বসে আছে, তোর ছোট বোন একলা কাঁদছে···তোর ভাই দুঃখী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তোর বৌদিও।]

'বিদাই' লোকগীতের সংখ্যার কোনশেষ নেই বললেই চলে—বিভিন্ন ভাব ও ব্যঞ্জনায় বহুগান ছড়িয়ে রয়েছে। একটি গানে আমরা দেখতে পাই মা মেয়েকে মানুষ করে তোলার নানান উদ্বেগ ঝঞ্ঝাট এবং বিপদের বর্ণনা করে মেয়ের শাশুড়ীকে সম্বোধন করে জানায়—আমার আদরের ধনকে আমি বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছি, তাকে তুমি গাল দিও না। অন্য আর একটি গানে স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতেও স্ত্রী বলে—হে স্বামী, একবার তোমার ঘোড়ার মুখ ফেরাও, আমার বাবার আদর ভালবাসার কথা মনে পড়ছে। তিন আর একটি গানে আরো করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। গীতের প্রথম অংশে রোরুদ্যমান কন্যাকে রথে আরোহন করতে দেখে বাবা-মা ও অন্য গুরুজনদের বিলাপ বর্ণনার শেষে দেখা যায় বাবা নগ্ন পায়ে দৌড়তে দৌড়তে রথের চাকা ধরে রথ থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে—সত্যই অত্যন্ত মর্মন্তুদ সে দৃশ্য।

রাজস্থানী বিবাহের বিভিন্ন মঙ্গল লগ্নে ও লোকাচার উপলক্ষে গীত এই নিবন্ধে যে লোকগীতিগুলির আমরা উল্লেখ করেছি তা মূলত কন্যা পক্ষেরা গেয়ে থাকে। বরপক্ষের গীত এমন ব্যাপক না হলেও তার সংখ্যা কম নয়। ভবিষ্যতে ভিন্ন প্রবন্ধে তার উল্লেখ করার বাসনা রইল।

এই সরল শব্দ-সংযুক্ত প্রাচীন রাজস্থানী লোকগীতিগুলি বাস্তবিকই আমাদের শাশ্বত সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতীক।

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

১। রাজস্থানী সাহিত্য বা ইতিহাস—ডঃ পুরুষোত্তমলাল মেনারিয়া
২। রাজস্থান কে লোকগীত—ডঃ স্বর্ণলতা অগ্রবাল
3. Sound of Rajasthan—Dr. U. B. Mathur.

হোলি বামাচরণ মিত্র অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রমোহন ভৌমার্দার

[বামাচরণ মিত্র উড়িষ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত লেখক ও সাহিত্যিক। তাঁর একাধিক গল্প ও প্রবন্ধের বই আছে। ১৯৭৩ সালে তিনি প্রবন্ধের জন্য প্রভাতরু পুরস্কার লাভ করেন।]

ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত। শীতের জড়তা ত্যাগ ক'রে পৃথিবী ক্রমে সূর্যের প্রখরতার অভিমুখী। মাঘে এই সময় স্থিতি। বৃক্ষলতা কোমল কচি পাতায় কমনীয়। পলাশবনে আগুন লেগেছে। আমবনে কোকিল বার বার অধীরভাবে ডেকে উঠছে। মধুমদলোভী ভ্রমরকুল চূতমঞ্জরীর সুবাসে উন্মত্ত হয়ে এক গাছ হতে আর এক গাছে সঞ্চরণরত। চারিদিকে অপূর্ব কমনীয় শোভা। জলেস্থলে মরুৎ ব্যোমে বসন্তের বৈজয়ন্তী, দেহে মনে অপূর্ব সংবেদন-স্পন্দন।

নবীন বর্ষার মেঘের ন্যায় যাঁর কান্তি, যাঁর কিরীটে কোটি কোটি সূর্য বিরাজিত, প্রতি লোমকূপে যাঁর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে, যাঁর বাঁশি অহরহ ডাকছে প্রতিটি জীবকে এস এস বলে, সেই বাসন্তী বসন-পরিহিত, আজানুলম্বিত-বনমালা-শোভিত, অতি কমনীয় সুঠাম ত্রিভঙ্গ বিগ্রহ বসন্তোৎসবে মত্ত। হোলি খেলত নন্দকুমার। আমরা আমাদেরি মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তাঁরে রচনা, বৈজ্ঞানিকেরা বসন্তের বা বসন্তোল্লাসনার যে কোনও ব্যাখ্যাই দিন না কেন।

আজ দশমী তিথি : কিন্তু একাদশীও পড়াতে পকদোল আরম্ভ আজ থেকেই। কৃষ্ণভদ্রার এপার কৃষ্ণপুরের লোক আজ থেকে পাঁচদিন অবধি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউকে নিয়ে যেতে ওঠে, হোলি খেলে, এ ওকে আবির মাখায়। প্রতি বৎসরের মত আজও শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ দ্বারে দ্বারে ঘুরে আনন্দ বিতরণ করছেন তাঁর সঙ্গে যারা হোলি খেলতে বেরিয়েছে তারা আবিরের থালা হাতে নিয়ে মাদল বাজিয়ে গাইতে গাইতে চলেছে—রাধা বল্লভ মোহন খেলে হোরি—। ছেলেরা দল বেঁধে আগে আগে নাচতে নাচতে চলেছে, প্রত্যেকে মুখে আবির মেখে গায়ে ডাল-পাতা বেঁধে যেন বাঁদর সেজেছে। ধোপ-দুরস্ত কেউ চোখে পড়ে গেছে কি মাদল অমনি আরো জোরে বেজে ওঠে, ছেলের দল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে তার দিকে ছোটে, গায়কেরা মহানন্দে গাইতে থাকে—

কোই কোই গাওরে কোই কোই বজাওরে
কোই কোই মারত পিচকারি—

বেলা প্রায় দুপুর হয়েছে। প্রায় পরিক্রমা শেষ ক'রে ঠাকুর দোলতে দুলতে নদীর দিকে আসছেন। কৃষ্ণভদ্রায় অবগাহন ক'রে ফিরে যাবেন। হোলি খেলুড়েরাও ইত্যবসরে স্নান সেরে নেবে।

আজ ঈদুজ্জোহা—আজ কোরবানির দিনও পড়েছে। রহিম খাঁ ঠিক এই সময়ে কৃষ্ণভদ্রার আড়পার

আহমদপুর (যাকে এপারের লোক আজকাল আড়ালে পাকিস্তানপুর ব'লে থাকে) থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে যাচ্ছেন কুশুপুরের রাম-অ পধানের বাড়ি ঈদ মোবারক জানাতে। হাতে তাঁর একখানি থালায় কিছু বিরিয়ানি, কাবাব, পোলাও ইত্যাদি। রহিমের বিবি জেবউন্নিসা বড় ভাল রান্না করেন, তিনি নিজে তাঁর প্রিয় দেওর রাম পধানের জন্য এ সব রেঁধে মিঞার হাত দিয়ে পাঠাচ্ছেন।

রাম-অ পধান ও রহিম খাঁ আবাল্য বন্ধু। রহিম অবশ্য রাম পধানের ভাগচাষী কিন্তু তাঁর বংশানুক্রমে তিনি আহমদপুরের খলিফা। এই খলিফা বংশ আর পধান বংশের বন্ধুত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাধা অতিক্রম করে অন্য এক ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছে আজ চার পুরুষ যাবৎ। খলিফা বংশ হ'ল পধান বংশের 'সুখ দুইখ' বন্ধু। এক বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম কিছু হলে অন্য বাড়ির স্ত্রীপুরুষ সকলে তাতে যোগ দেন, বিয়ে বাড়ি লাগলে তেল হলুদ যায়, ব্যবহার আসে। কখনও হয়তো সামাজিক আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু এখন এই দুই বাড়ির বন্ধুত্ব এক আদরণীয় ব্যতিক্রম বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে। আবার, রহিম খাঁ আহমদপুরের খলিফা ও রাম পধান কুশুপুরের গণ্যমান্য লোক হয়ে থাকায় এই দুই গাঁ কতকগুলি স্বার্থান্ধ নেতাদের ঘরভাঙানী কৌশল তুচ্ছ করে ভিতরে ও বাহিরে সদ্ভাব রক্ষা ক'রে আসতে পেরেছে। ব্যক্তিগত ভাবে দেখতে গেলে এই বন্ধুত্ব রহিম খাঁ ও রাম পধানের মানসিক ব্যাপ্তি অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ধর্মের প্রতি দু'জনের আন্তরিক নিষ্ঠা থাকায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় হয় রাম পধানের বাড়িতে নয়তো রহিম খাঁর বাড়িতে ব'সে দু'জনে গীতা বা কোরানশরিফের চর্চা করেন, করে মুগ্ধ হন আনন্দিত হন।

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউ হেলতে দুলতে নদীর বাঁধের উপর উঠছেন। রাম পধানের নাতি প্রথমে রহিমকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল আরে, এই যে 'অজা' (দাদু)! বড়রা হাঁ হাঁ করতে করতেই নাতি গিয়ে দাদুর দাড়িতে আবির মাখিয়ে দিয়ে হাত তালি দিয়ে নাচতে লাগল। রহিম প্রথমে মন খুলেই হেসে উঠলেন, কিন্তু তার পরেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল অল্পদিন আগে গরু মারা বন্ধের কথা নিয়ে দুই গাঁয়ের মধ্যে যে কাণ্ড হয়ে গেছে তাতে আহমদপুরের সবাই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। সে রাগ কোনোমতে খাপখুপ দিয়ে রাখা হয়েছে। গরুর মাংস খেলে নানা রোগ হয়, তাই না খাওয়া ভাল, আমাদের হিন্দু ভাইরা আমাদের ভালর জন্যই বলছে— খলিফা এই ব'লে বোঝানোতে আহমদপুরিরা এক রকম না বুঝেও বোঝার মত আছে, কিন্তু সে অপমান মনের কোণে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে অনবরত। গোমাংস ত্যাগ করা নিয়ে কিছু নয়, তা করতে বাধ্য করানোটা তাদের ধর্ম ও ব্যক্তিত্বের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন বলে তাদের মনে হচ্ছে। তাই আবির মাখানো নিয়ে আজ আবার কি কাণ্ড হয় কে জানে। ততক্ষনে আর সব ছেলেরা এসে রহিমকে ঘিরে ফেলেছে, রহিম হাতের থালাটা উঁচু ক'রে তুলে ধরে চিৎকার করছেন—আরে, হম্ মুসলমান, কিন্তু ছেলেদের তখন সে কথা শোনবার মত অবস্থা নয়। রহিম চকিত দৃষ্টিতে আহমদপুরের দিকে চাইলেন। গাঁয়ের অন্যান্য মুসলমান ভাইদের কথা না শুনে তিনি আজ এসেছেন আর এখন এই ব্যাপার। হোলি খেলুড়েদের মধ্যে যাঁরা মাতব্বর তাঁরাও সন্ত্রস্ত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চেয়ে রয়েছেন।

নিমেষের মধ্যে একটা তোলপাড় হয়ে গেল। ফুলের ভিতর থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল গোখরো সাপ। আহমদপুরের ছেলেরা আশেপাশে লুকিয়ে থেকে সব দেখছিল, এখন ছুতো পেয়ে তারা আগের অপমানের শোধ তোলার জন্য দলে দলে লাঠি-সোটা সড়কি-বল্লম ইত্যাদি নিয়ে 'মারো শালে কাফের কো' 'আল্লা হো আকবর' 'কোরবানি কোরবানি' চিৎকার করে লাফ দিয়ে ছেড়ে এল। কুশুপুরের একজন দৌড়ে গিয়ে গাঁয়ে খবর দিতে সেখান থেকেও তেমনি দলে দলে সবাই 'রাধাবল্লভজী কি জয়' বলে দৌড়ে এল নদীর চরে। চরের উপরে দুই দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

রহিম প্রথমটা ভেবাচাকা খেয়ে কিছুক্ষণ নদীর বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গা কাঁপতে লাগল। বাধা দেবার শক্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু নিজেকেই এর জন্য দায়ী মনে ক'রে কিছু একটা করতেই হবে ভেবে সেই দাঙ্গার ভিতর ছুটে গেলেন। কিন্তু তখন আর কেউ মানুষ ছিল না, সবাই ক্রোধের এক এক যন্ত্র। তাঁর কথা কারও কানে ঢুকল না। তিনি ধাক্কা খেতে খেতে ছিটকে এসে পড়লেন নদীর জলে। চোখের সামনে দেখলেন তাঁর সাঙ্গাত রাম পরানের ছেলে নব শাবলের এক ঘায়ে তাঁর ছেলে আবদুলের মাথার খুলি হুফাঁক করে ফেলল। আবদুলের সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে গেল। তবু পড়তে পড়তেও সে নবর বুকে শাবল বসিয়ে দেওয়ায় নবর বুক থেকে রক্তের ফোয়ারা বেরিয়ে কুশডাঙ্গার সরস বালিতে পড়তে লাগল। তারপরেই নব আর আবদুল জড়াজড়ি করে পড়ে গেল।

রহিম আর সামলাতে পারলেন না। 'মারো শালে কাফের কো' বলে চিৎকার করে তিনি আবার ছুটে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল এখন 'সলাতুল-জোহর্' । নমাজ প্রার্থনা)-এর সময়, থমকে দাঁড়ালেন, কি করবেন বুঝতে পারলেন না। আজ পর্যন্ত কোনো দিন তিনি সেই নমাজ ছাড়েন নি, কারণ কোরান শরিফে আদেশ আছে এই নমাজটির দিকে বিশেষ করে মন দেবার। ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, তবু তিনি কুশডাঙ্গার জলে হাতমুখ ধুয়ে বালিতে গামছা পেতে নমাজ পড়তে লাগলেন। কোরান শরিফের কথা তাঁর কানে বাজছিল :— সব মানুষ এক····আমাদের ভেদভাবই পাপ····আমাদের অহং স্বার্থবুদ্ধি ও অবিদ্যা এই পাপকে বাড়ায়····যে সংযমী খোদা তাকেই ভালবাসেন····যারা ভগবানের নামে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে তাদের ধিক্কার কর····। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও নমাজে মন বসাতে পারেন না। আবদুলের মৃতদেহের উপর চোখ পড়া মাত্র কেবল হিন্দুদের উপর ক্রোধ ঘৃণা ঈর্ষা প্রবলভাবে ভিতর থেকে ঠেলে আসতে থাকে। নমাজের সঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছিল নিজের কথা—কাফের এরা, এরা মুখে বলে এদের ধর্ম উদার, এদিকে সরকারী পয়সায় মন্দির বানায়····এরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী বলে জবরদস্তি তাদের হোলি আমাদের পালন করতে হবে!····এদের বিশ্বাস নেই····পাকিস্তানে চলে যাব····এদের 'ভাই ভাই' বুলি কেবল এক ফরেব (ছলনা)···হিন্দু ধর্মই ধরেবী ধর্ম··· শালে কাফের····। নমাজ ছেড়ে উঠে ছুটে গিয়ে একটা হিন্দুকে মেরে ফেলতে ভারী ইচ্ছা হয়, কিন্তু আবার কোরাণ শরীফ মনে পড়ে যায় :—জীবন মরণ খোদার হাতে····অন্যের পাপ দোষ ত্রুটির দিকে নজর না দিয়ে তাদের সদবেদনা জানাও····। তাঁর মনের মধ্যে এমনি টানা হেঁচড়া চলেছে। শেষে আর থাকতে না পেরে হঠাৎ নমাজ ছেড়ে উঠে প'ড়ে মৃত আবদুলের হাত থেকে শাবলটা টেনে 'জিহাদ—জিহাদ' বলে চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেলেন—নমাজ ছেড়ে উঠে আসার লজ্জা সইতে না পেরে। সূর্য তখন ঠিক মাথার উপরে। আকাশে শকুন চক্কর দিচ্ছে। কুশডাঙ্গার তীরে আম বাগানে কোকিল ডেকে চলেছে। নব আর আবদুল জড়াজড়ি ক'রে পড়ে থাকে। দুই দলের মধ্যে মারামারি তেমনি চলে।

রাম পরান যখন ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেলেন তখন তিনি হালের বলদদের খাওয়াচ্ছেন, যেমন রোজ খাওয়ান। খবর শুনে তাঁর পা অচল হয়ে এল। কি করবেন বা কি করা উচিত ভেবে পেলেন না। বাড়ির ভিতরে হঠাৎ কান্নার রোল শুনে তিনি আরও হতভম্ব হয়ে গেলেন। মনে হল কে যেন বলল নবর মা মূর্ছা গেছেন। তবু তিনি স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত শরীর রাগে কেঁপে উঠল। কাছে কাটারিটা প'ড়ে ছিল, সেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নদীর দিকে কিছুদূর ছুটে গেলেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে রহিমকে কেটে তার রক্তে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউকে হোলি খেলাবেন। তাঁর মনে পড়তে লাগল যুগে যুগে হিন্দুর উপর মুসলমানদের অত্যাচার, আওরংজেবের অত্যাচার,···ওদের ধর্মই বিচ্ছুরতার উপর প্রতিষ্ঠিত—দয়ামায়া নেই···ওরা ব্যাভিচারী

নরহন্তা অবিশ্বাসী···শালারা যাক চ'লে পাকিস্তানে···· কিন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর মনে প'ড়ে গেল মহাভারতের কথা। স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্র বলেছেন, যে ধর্ম অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে তা কুধর্ম··· রহিম বলছিল কোরানে আছে ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি পাপ। মনে প'ড়ে গেল তাঁর 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য—'··· রহিম আর আমি নিরাসক্ত হবার জন্য কত প্রার্থনা করেছি আমরা, সে সব কি এই চরম পরীক্ষার সময় ব্যর্থ হয়ে যাবে··· হে রাধাবল্লভ আমায় বল দাও—বল দাও। মনে মনে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্মসমাচর····
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ···
পাপমানম্ প্রজহি হেনম্ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্···

দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হাতের মুঠো আলগা হয়ে কাটারিটা সশব্দে মাটিতে পড়ল। মনে হ'ল কাটারিটা হো, হো ক'রে হেসে বলছে- ভীরু, সব হিন্দুই ভীরু, ভগবান্ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কতই না বলেছেন, কিন্তু কি হবে, সব ভীরুর দল··· তোমাদের উদারতার জন্যও এই ভীরুতা থেকে··· রাম পধান আবার কাটারিটা তুলে নিয়ে কিছুদূর ছুটে গেলেন, আবার থম ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অসহায়ভাবে উপর পানে চেয়ে হাতজোড় করে বললেন—হে রাধাবল্লভ, আমি অর্জুন নই যে এই দুই বিপরীত ভাবকে এক করতে পারব, আমায় রক্ষা কর প্রভু··· বলতে বলতে তিনি অচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন।

ততক্ষণে পুলিশ এসে নদীর চরে মৃতদেহ দুইটির খবরদারি করতে দাঁড়িয়ে গেছে, দুই দলের অনেকে গ্রেফতার হয়ে চালান হয়ে গেছে। চৌকিদারেরা হুকুম তামিল করছে। কোকিলের অধীর রব বন্ধ হয়নি। সূর্যদেব পশ্চিমে চলেছেন। পশুপক্ষী ঘরমুখো যেতে শুরু করেছে। কুশতরায় স্রোত তেমনি কুলু কুলু নাদে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। পৃথিবী তেমনি ঘুরে চলেছে কালহীন মহাকালের মধ্যে কাল সৃষ্টি করে। এত যে কাণ্ড হয়ে গেল কারও যেন তাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ হোলিখেলা সাঙ্গ ক'রে শুয়ে পড়েছেন।

• • •

রাত্রি প্রায় তিনটা। প্রতিদিনের অভ্যাস বশতঃ রাম পধান ঘুম ভাঙতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন আড়পারের মোরগের 'চক্রধর-অ রক্ষা কর' ডাক শুনে। রাধাবল্লভকে প্রণাম ক'রে তিনি কান পেতে রইলেন রহিমের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি শোনার জন্য। এটি তাঁর নিত্যকার অভ্যাস।

বাহিরে নিস্তব্ধ ঘোর রাত্রি, সুন্দর উদার নির্লিপ্ত। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন। গাছপালাও ধ্যানস্থ। কুশতরায় ঘরে আগুন জ্বলতে দেখে রাম পধানের মনে প'ড়ে গেল সব কথা। সমস্ত ঘটনা যেন আবার একবার তাঁর চোখের সামনে ঘটে গেল, কিন্তু এখন তিনি শুধু নির্লিপ্ত দর্শক, মনে কোনও ভাবান্তর নেই! কেবল যখন মনে পড়ল যে এ ঘটনা রহিমকে হয়তো শয্যাগত ক'রে ফেলেছে তখন মনে বেদনা অনুভব করলেন। ধীরে ধীরে তিনি চললেন নদীর দিকে।

রহিমেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে ঠিক সেই সময়েই। তিনিও শোনার অপেক্ষায় আছেন, 'রাধাবল্লভ হে—' ডাক। রহিমের বৃদ্ধা মা ও ঘর থেকে লহর তুলে কাঁদতে কাঁদতে শুধালেন—এ রহিম, আরে রামচন্দর উঠিস্ নেই কেরা, কিউ? আরে, এ রহিম নিকম্মা কাহেঁকা, আরে যাঁকে দেখো কেরা হুয়া উসকো—বৃদ্ধা আর বলতে পারলেন না বেদম কাঁদতে কাঁদতে থেমে গেলেন। প্রতিদিনের অভ্যাস তাঁর এই সময়ে উঠে রহিমকে তুলে দেওয়া। রহিম উঠে নমাজ প'ড়ে চ'লে যায় সাঙাতের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে। রহিম চেঁচিয়ে বললেন—যাতাহুঁ অম্মিজান, তুম্ মাৎ ফিকর্ করো, খাসি (কাশি) বঢ়্, যা এপি। রহিমও আস্তে আস্তে চললেন নদীর দিকে।

বাড়ির চারে আগুন জ্বলতে দেখে তাঁর যেন কেমন অবাক লাগল : তবে কি সাত্তার আমার না ডেকে সব দাহ ক'রে দিলেন ! অভিমানে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে এল। কিন্তু আগুনের কাছে গিয়ে দেখলেন তারা তিনজন বিদেশী ধুনি জেলে হোলির গান গাইছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলেন তারা বিহার প্রদেশের লোক, পুরী দর্শন ক'রে পায়ে হেঁটে আসতে আসতে পথ ভুলে রাতটা নদীর চরেই কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা গাইছিল—

ললিনী লালন লাল অভিরম সখিগন লালহি লাল।
লাল ভরু সকারি লাল দিন যামিনী লালহি পিয়ারকি লাল ॥

রহিম বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেইখানে। চেয়ে দেখলেন আবদুল ও নব অদূরে জড়াজড়ি ক'রে প'ড়ে আছে তেমনি। পুলিশ তখনও নব দুইটি ডাক্তারখানায় পাঠায়নি ময়না তদন্তের জন্য. চৌকিদারেরা আগলে ব'সে আছে। একজন বিহারী পুলিশ বিদেশীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গান গাইছে : অদূরে শকুনের ডানা-ঝটপটানি আর শেয়ালের ডাক শোনা যায়, কিন্তু আগুনের ধারে চলেছে একেবারে আর এক রকম ব্যাপার। কারও সঙ্গে কারও যেন সম্পর্ক নেই, কিংবা যেন এই সব বিপরীতের মধ্যে কোথায় একটা সম্পর্ক লুকিয়ে আছে। আশ্চর্যের কথা, সেই বিদেশীদের ভিতর থেকে একজন হঠাৎ রহিমকে বলে বসল—এক রোটি শুনাইয়ে ভাইয়া।

রহিমের অন্তরে হঠাৎ একটা অদ্ভুত আকুলতা জাগল। সে আকুলতা দুঃখের নয়, আনন্দের নয়—কি এক অজানা অপূর্ব বেদনায় তাঁর অন্তর মথিত হ'ল। ভিতর থেকে আপনি যেন বেরিয়ে এল কাফি সিন্ধুতে—বলমা রে, চুনরিয়া মাযরকা লাল রঙা দে—ওগো মোর প্রিয়, আমার এ আবরণ তোমারি রঙে রাঙিয়ে দাও। গলা থেকে গমগম ক'রে তাঁর আওয়াজ বেরুচ্ছে, ঝরঝর ক'রে চোখ থেকে জল পড়ছে। গান শেষ হওয়ার পরেও সবাই নিশ্চল, নিশ্চুপ। প্রশংসা করার কথাও বুঝি কারো মনে হয় না।

হঠাৎ 'সোভান্ আল্লাহ্' শুনে চমকে উঠে, রহিম দেখলেন কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর সাত্তার. চোখ থেকে তাঁর জল ঝরে পড়ছে। হঠাৎ তিনি গাইতে শুরু করলেন—

আসাদো আল্লা ইলাহা ইল্ আল্লাহ্,
আসাদো অননা মুহম্মদর্ রসুলাল্লাহ্—

রাম পধানের স্বর-বিভোর সবাইকে অভিভূত করলো। ধীর মন্থর গতিতে পরিষ্কার অথচ করুণ স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে প্রত্যেকটি শব্দ তাঁর কণ্ঠে। বিদেশীদের মধ্যে একজন আনন্দে ব'লে উঠল—অব্, ভগবান্ অকর হিঁয়া হোঙ্গে। কোরান শরিফ কহ্তি হৈঁ ভগবানকা নাম হুনকর্ বিশ্বাস কিয়া উছলতা এহি ভক্ত, ঘায় ; ও হিন্দু হো ইয়া মুসলমান। ভগবান খ্রীকিষণ কহে হৈঁ হামারা ভক্ত, যাঁহা হাম্ হুঁয়া রহতা। বন হাম আপ্ লোগ্।

ভোরের হিমেল হাওয়া তখন বইতে শুরু করেছে। পূবের আকাশে প্রভাতী তারা ঝলমল্ ক'রে জ্বলছে। আরবপুর থেকে ভেসে আসছে প্রভাতী প্রার্থনা ও কৃষ্ণপুরের প্রভাতী বন্দনা।

বিদেশীরা পথ খুঁজিয়ে চ'লে গেল। রহিম রাম পধানকে বুকে চেপে ধ'রে শুধোলেন—সাত্তার, আমাদের ছেলেরা পরস্পরের হাতে মরল, তবে কি খোদা চান আমরা চির শত্রু হয়ে থাকি ?

রাম পধান হেসে বললেন, সে কি হাসি !—ভাই দেখ, নব আর আবদুল কেমন জড়াজড়ি ক'রে শুয়ে আছে। ভগবানের ইঙ্গিত—আমরা নতুন ক'রে পরস্পরকে চিনব ; ছলনায় নয় স্বার্থে নয় রাজনীতি দিয়ে নয়, আপনাকে বলি দিয়ে—।

দু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে চললেন নদীর উজানের দিকে—স্নান করতে, রোজকার অভ্যাসমত।

প্রেয়সীর মতো ॥ মমতা কালিয়া ॥ অনুবাদ ॥ প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ

[আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্য জগতে মমতা কালিয়া একটি বলিষ্ঠ সংযোজন। অল্প লিখে যাঁরা সাহিত্য সভায় নিজের আসনখানি পাকাপাকি করে নিতে পারেন উনি তাঁদের অন্যতম। তরুণী লেখিকা ব্যক্তিগত জীবনে একটি কলেজের অধ্যক্ষা।]

আমি বিবাহিতা। হোস্টেলে থাকি। না, স্বামী-পরিত্যক্তা নই।

গত সপ্তাহেই কুমার আমাকে এই খাঁ খাঁ করা শূন্য কবিতবে একা করিয়ে রেখে গেছে।

তখন তার সন্ধ্যেবেলা। প্রায় সবকটি কুটুরিই বন্ধ। সুপারিন্টেন্ডেন্ট বললেন—'মেয়েরা বিকেলের দিকে ঘুরতে বেরোয়। রাত আটটায় হাজিরা ডাকা হয়। তার আগেই ওরা ফিরে আসবে।'

কুমার আমাকে কয়েকটা ফোন নাম্বার লিখে দিয়ে গেছে। কিছু বোম্বাইয়ের। আর ওষুধ-পত্রের নামও মুখস্থ করিয়ে দিয়ে গেছে—শরীর-টরীর খারাপ করলে প্রাথমিক উপাচার হিসেবে যা কাজে লাগবে। কিন্তু এই মুহূর্তে একটিরও নাম মনে আসছে না আমার।

ও সেদিন একটা ম্লান হাসি আমার উদাস চোখের পাতায় গলগলিয়ে ঢেলে দিয়ে চলে গিয়েছে।

এ ধরনের বিচ্ছেদের ঘটনা বার কয়েক ঘটেছে ইতিপূর্বে। কতবার যে জীবন আমাদের দুজনকে দোপায় পাটের ওপর আছড়িয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। এবং এই টানা-হেঁচড়ার দরুণ আমাদের দুজনকে ফ্ল্যাট থেকে বস্তি এবং বস্তি থেকে হোস্টেলে মাথা গুঁজতে হয়েছে। দু-দুটি বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও আমাদের চারপাশের কুয়াশার ঘোর কাটেনি আজও।

জানি না কুমার দিল্লীতে কোথায় গিয়ে উঠবে। ওর পকেটে যে গোনা-বাঁধা শ তিনেক টাকা আছে তাতে ক'দিনই বা চলবে।

সত্যি, ভাবলে হাসি পায়। নামে লেকচারার অথচ মাসান্তে গুনে গুনে মাত্র তেত্রিশটি টাকা পাই। গত তিন বছর ধরে আমি উইমেন্স কলেজে পার্ট টাইম লেকচারার হয়েই পড়ে আছি। প্রতি বছর আমাদের কলেজে নতুন নতুন এ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে কিছু নতুন পদোন্নতি ঘটছে—অথচ আমি আজ অবধি উন্নতির লম্বরেখা ডিঙোতে পারলাম না! নতুন নতুন শাড়িতে জড়ানো যে সব নতুন নতুন মুখ ক্রমাগত দেখে আসছি, তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে জেনেছি কারো স্বামী শহরের পটেটো-কিং, কারো বাবা ঘড়ির বিরাট ব্যবসায়ী কিংবা কারো কাকা ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার। আমার ভিতটুকু কতো দুর্বল - কতো নড়বড়ে। এবং সঙ্গত কারণেই আমাকে পার্ট-টাইমার হয়েও সমানে পুরো খাটুনি খাটতে হয়। অথচ ওরা ফুল টাইমারের বেতনে পার্ট-টাইমারের ডিউটি করে কর্তব্য ইতি টেনে দিতে পারে।

এখন থেকে আমাদের দুজনকে আলাদা আলাদা শহরে থেকে জীবন যুদ্ধ করে যেতে হবে। কুমার বলে—বোম্বাইয়ের যাবতীয় সম্ভাবনায় নয়লায় কড়া নেড়ে দেখেছে ও। কাজেই দিল্লীতেও যে ওর কোনো হিল্লে হবে—আমার মন সায় দেয় না। দিল্লী শহরটা আরো বেশি নিষ্ঠুর। সাইকেল এবং ধোঁয়া ভর্তি উদ্যমমুখো শহরটার কাছ থেকে কী-ই বা আশা করা যায়? এ শহরের নামে ঘেন্নায় আমার গা রি রি করে ওঠে।

····সাত সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখলাম রুম মেট জ্যোতি দেব তখনো ঘুমে অচেতন। আমি আমার সংক্ষিপ্ত এবং নিঃসঙ্গ-নিস্তরঙ্গ বিছানা খানার দিকে তাকালাম। এবং এক বুক হাওয়া নিয়ে ভাবতে বসলাম—'আমি মুক্ত····আমি স্বাধীন····!' কিন্তু, তেমন কোনো রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগলো না পোড় খাওয়া মনের পরতে। সামনেকার টেবিলে আমার ছোট্ট পার্সটা পড়ে ছিলো। তাতে ধন-সম্পত্তি বলতে মাত্র চার টাকা পঁচিশ পয়সা। সোয়া চার টাকার স্বাধীনতা অথবা মুখ খারাপ করে বললে 'ফুটানি' কতক্ষণ আর টেঁকে!

'ঠিক আছে স্বাধীনতা পনেরোই আগস্ট ভোগ করা যাবে 'খন।' মনে মনে ধার্য করে ফেললাম। এবং পরক্ষণেই চা খেতে উঠে পড়লাম।

হ্যাঁ, ষাটটি টাকার বিনিময়ে যে জাতীয় খাবার এবং সুখ পাওয়া সম্ভব, তা আমি পাচ্ছিলাম। মিথ্যে বলবো না। এবং কুড়িটি টাকা মাসিক ভাড়া হিসেবে একটা ঘরের যতোটুকু অংশ পাওয়া সম্ভব তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়নি। প্রথম মাসের যাবতীয় ধার-দেনা শোধ করেও দেখি আমার কাছে দশ টাকার সাত-সাতখানা নোট রয়েছে। আমি তখন আনন্দে প্রায় দিশেহারা। এতো টাকা জীবনে এর আগে কখনো এক সঙ্গে দেখতে পাইনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে আবার মনের তাঁজে তাঁজে একটা অসহ্য প্রশ্ন মাথা কুটে মরতে লাগলো। কুমারও কী নিজেকে এতোটুকু মুক্ত অনুভব করতে পারছে?

উত্তর পাবার উপায় ছিলো না। কারণ, চিঠি-পত্রে আমরা আমাদের অর্থশাস্ত্র উহ্য রেখে প্রেম-প্রসঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠতাম। তাছাড়া একখানা অন্তর্দেশীয় পত্রে জায়গায়ই বা কতোটুকু?

ইদানীং এ ধরণের নিঃসঙ্গতা এবং আত্মনির্ভরতা আমাকে প্রশান্ত-উজ্জ্বল করে তুলেছে। কেন না অনেক কষ্টে অ-নে-ক প্রতীক্ষার পর এ সৌভাগ্যটুকু জোটাতে পেরেছি আমি।

হোস্টেলের বাঁ দিকে বেশ কয়েকজন সিনিয়র প্রফেসরদের কোয়ার্টার'। ঘরগুলো অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং বেশ ছিমছাম। আলাদা-আলাদা বাথরুম। একই হোস্টেলে পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও ওঁরা 'কনিষ্ঠাদের চপলতা-উচ্ছলতার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে যথেষ্ট মনোযোগী। ওঁদের পৃথিবীতে ঢোকার ছাড়পত্র হিসেবে যে পরিপক্কতাটুকুর নিতান্ত প্রয়োজন, তার স্পর্শ না আমার চুলে লেগেছে, না কথায়, না বেতনে।

অথচ কেন জানি না ইদানীং আমি নিজেকে আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ভেবে চলেছি। হয়তো জীবনের তিনটে বড়ো ব্যাপার—আহার, বস্ত্র, আবাস—আমার বরাতে জুটেছে বলেই। নির্জন রাতের অবলম্বন হিসেবে যতোটুকু বিরহ কিংবা বিয়োগ ব্যথার প্রয়োজন—তাও আমার রয়েছে। বাকী সময়টুকু নিয়েই আমার দুর্ভাবনার অবধি নেই। ক্লাশ এবং নিজের শরীরটার যত্ন আত্তি করার পরও বেশ কয়েকটি ঘণ্টা হাতে থাকে। প্রতিটি বিলম্বিত সন্ধ্যায় হোস্টেলে একা একা 'উপেক্ষিতা'র মতো পড়ে থাকাটা আমার মনে ঔদাসীন্য না ঢেলে কলসি-কলসি লজ্জা ঢেলে দেয়।

সময়-সমস্যাটির ওপর যথেষ্ট মাথা ঘামানোর পর একটি যুক্তি মাথায় খেলে গেলো। এমন একটা সোজা কথা এ যাবৎ মাথায় এলো না কী করে—আশ্চর্য!

ঠিক সেই মুহূর্তে তেরো নম্বর (আনলাকি থার্টিন) ঘরে বসে নিজেকে মিছিমিছি খানিকক্ষণ বসিয়ে

বসিয়ে 'বুদ্ধু' ভাবতে থাকলাম। নিজেকে সাহিত্যের এমন একজন সমঝদার ভাবা সত্ত্বেও কখনো খেয়ালই করিনি যে বিশ্ব সাহিত্যসভায় যাঁরা এপর্যন্ত পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছেন—তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও রয়েছেন। আন্না ক্যারিনিনা, ম্যাডাম বোওয়েরি, লেডি চ্যাটার্লি এবং মীরা বাঈ।

হ্যাঁ, আমার বর্তমান জীবনটুকুও একটি ছোটো-খাটো প্রেমোপাখ্যান অবলম্বন করে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও বিষয়টির ওপর বেশ কিছুক্ষণ মস্তিষ্ক চালনা করলাম। না, কোনো দিনই আমি চাইনি—মজনুমার্কা কোনো 'নায়ক' আমার পায়ে পায়ে বেড়ালের মতো ঘুরে আমার ব্যক্তিগত এবং সংসারগত জীবন বিপন্ন করে তুলুক। একটা সরল-সাবলীল সংক্ষিপ্ত প্রেম-কাহিনীই চিরদিন আমি আমার জীবনে প্রতিভাত হতে দেখতে চেয়েছি আজীবন·····।

হিজিবিজি কতো কী ভাবতে ভাবতে একসময় কৃষ্ণকে ফোন করে বসলাম।

কৃষ্ণকান্ত যেই শুনলো—আমি হোস্টেলে রয়েছি এবং কুমার দিল্লীতে—প্রায় ছুটতে ছুটতে লাফ টাইবে চলে এলো। গত ছ মাস ধরে ও আই. এস. এস. মহাদেব-এ কাজ করছে। এবং ইতিমধ্যেই দেশ-দেশান্তরের কতো সমুদ্র-নদী-বন্দর দেখে এসেছে।

কৃষ্ণ ভিজিটার্স রুমে জানালাম। ও ব্যস্তভাবে যে কটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো তার অধিকাংশই কুমারের স্বাস্থ্য এবং চাকরিবাকরি সংক্রান্ত খবরাখবর।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে ও অভিমান জড়ানো গলায় বলে উঠলো—'এ তো কাণ্ড ঘটে গেলো অথচ আমি জানতেও পারলাম না বৌদি।'

কঠোর চোখে ওর দিকে তাকালাম। কারণ, সে মুহূর্তে নীল বর্ণ ম্যাক্সিতে—আমি নিজেকে না ওর 'বৌদি' ভাবতে পারছিলাম, না ওকে আমার অতি আদরের ঠাকুর পো'! তাছাড়া এমনিতেও সম্পর্ক-মার্কা সম্বোধন সম্ভাষণে আমি সচরাচর আহ্লাদে আইসক্রিমের মতো গলে যাওয়া মেয়ে নই। আমার একটা ঝকঝকে তকতকে ছিমছাম নাম রয়েছে—সুজাতা।

আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে প্রথম দিনই আমি কুমারের এই বন্ধুটিকে 'কৃষ্ণ ঠাকুর পো' না বলে সোজা-সুজি কে কে. নামে ডেকেছিলাম। কে. কে.—কৃষ্ণ ককুকড়।

নিছক বন্ধুত্বের দৃষ্টিতেও ছেলেটিকে কোনো দিন আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। এর জন্যে হয়তো ওর চাকরিটিই দায়ী। তবু ওর মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো—যার দরুণ অতি সহজেই আমাদের বাড়িতে ও বন্ধু পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলো। ও সহজ-স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যে কোনো প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকতো—
—তা সিনেমা দেখারই হোক কিংবা মোটর বাইকখানা পর-পরিষ্কার করার হোক।

কৃষ্ণ বললো—'চলুন বৌদি, বাইরে বেরিয়ে চা-টা খেয়ে আসি।'

হাঁটতে হাঁটতে কৃষ্ণ বলতে থাকলো—গত কয়েক দিন ধরে ওর হাড়ভাঙা খাটুনি যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এমন অবস্থা হয়েছে যে বলতে গেলে ওর হাঁটু দুটো ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

জিজ্ঞেস করলাম—'এ তো দেশ দেশান্তর ঘুরলেন কিছু কেনা কাটা করেন নি?'

—'কার জন্যে?'

—'ভবিষ্যতের জন্যে।'

ও মুখ টিপে হাসলো—'আপনি দেখছি জীবন-বীমার এজেন্টদের মতো কথা বলতে শুরু করেছেন!'

এবার নারীসুলভ কৌতূহল ব্যক্ত করলাম—'বিয়ে করছো না কেন তুমি ?'

—'তেমন ভালো মেয়ে পাচ্ছি কোথায় আর !' বলেই ও থামলো। হাসলো। এবং চোখ দুটোয় মুঠো মুঠো আলো মেখে নিয়ে আগের কথার জের টেনে বললো—'ঠিক আপনারই মতো।

নিজেকে বেশ ধন্যা বোধ করলাম। একটা হেলদি কমপ্লিমেন্ট। ইস্, এই মুহূর্তে যদি কুমারও এখানে থাকতো এবং শেষোক্ত কথাটি তার সামনে বলতো কৃষ্ণ !

হ্যাঁ, তখন কুমার না ভেবেই পারতো না মোস্ট অর্ডিনারি বৌদের মতো সুজাতা কেলনা মেয়ে নয়। সেও গৌরবময় উপমার উত্তরাধিকারিণী !

মনে মনে ভাবতে থাকলাম—এ সুসংবাদটুকু কুমার-এর কাছে কীভাবে লিখে জানাই, যাতে প্রশংসাটুকু ওর সত্যি বলে মনে হয় ?

কৃষ্ণ ক্ষিপ্র হাতে জলন্ত সিগারেটটা নিভিয়ে ফেললো—'আপনি মাইণ্ড করেননি তো বৌদি ?'

—'কেন, কী হয়েছে ?'

—'অর্থাৎ আপনি খারাপ মনে করেন নিতো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে খানিকটা দূরে বসা একটি মেয়ের বিচিত্রপুরী শাড়িখানা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। আচ্ছা কতো দাম হতে পারে ?

—'আপনি মাছ-টাছ খান তো, বৌদি ?'

—'না। গন্ধটা দারুণ বাজে লাগে আমার !'

—'আমি কিন্তু কুকুড ফিস্-এর কথা বলছি। জাহাজে থাকাকালে আমার এতো বেশি মাছ খাওয়া হয় যে বাড়িতে বসেও নিরামিষ আকের চচ্চড়ি খেতে গিয়েও আস্তে আস্তে চিবোই— কাঁটা না ফুটে বসে আবার ! তাছাড়া কাঁকড়া...উঃ, রোস্ট বানালে সর্বনাশা স্বাদ খোলে, বৌদি....!'

—'তাহলে দেখা যাচ্ছে জাহাজে চাকরি নিয়ে বিশুদ্ধ একটি 'জুট' হয়ে দেশে ফিরেছো—তাই না ?'

একটু থেমে আবার বললাম—'হুঁ, সঙ্গত কারণেই কেউ সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে ঘুরে এলে আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাকে গোমূত্র খাইয়ে, মাথা ন্যাড়া করিয়ে 'জলচল' করে নিতেন।'

ও হেসে উঠলো। একটা ঝকঝকে হাসি।

বাইরে বেরুতে বেরুতে আমার মাথায় একটা ভাবনা ভর করলো—এও একটি মানুষ—বেপরোয়া, সদাউচ্ছল স্বাধীন আর আমিও একটি মানুষ একা একা থেকেও এতটুকু নিঃসঙ্গ নই। ঝকমকিয়ে হেসে উঠলেও যেন মনে হয় সে হাসি আমার মনঃস্থিতির বাস্তব প্রতিফলনই নয় !

আমাদের সামনে দিয়ে একটি 'ম্যাক্সি বয়েসী' মেয়ে 'মিনি' ছেলে চলে যাচ্ছিলো। কৃষ্ণ তাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। ভাবলাম আমি ওর সঙ্গে না থাকলে ও শিষ না দিয়ে ছাড়তো না। কিন্তু, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ওকে মরস্তুমের কথা পাড়তে হলো।

হোস্টেলের কাছাকাছি এসে পড়েছি। অগুণতি ছেলে-মেয়েরা জোড় বেঁধে 'বক বকম বক' শুরু করে দিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

টী-টাইমের তখনো বেশ কিছু দেরি। ভিজিটার্স রুমে বসে পত্র-পত্রিকা ঘাটছি। পাওয়ার মতো তেমন কিছু নেই। অধিকাংশই সিনেমার কাগজ। ঠিক সেই মুহূর্তে ডকটর ভার্মা যেন কোত্থেকে ঘুরতে এসে ঘুরন্তে হাজির—'এ কী তুমি এখানে একলাটি বসে ? তোমাদের কলেজে আজকে ক্লাসেস নেই ?'

ঘাড় নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানালাম।

উনি আগের কথার জের টানলেন—'আমি তো ভাই আজকের অনুষ্ঠানে কলেজের মালীকেই প্রধান অতিথি বানিয়ে এলাম। মালীই সবার আগে গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মালাদান করলো। মেয়েদের বললাম—শোনো, আমাদের ভি. আই. পি. গেস্টের দরকার নেই। গান্ধী-জয়ন্তীতে আমাদের গান্ধীজীর নীতিই পালন করা উচিত।'

ডক্টর ভার্মা স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যক্ষ। তবে ভদ্রমহিলার মুস্কিলটা হলো—নিজের বাহাদুরি জাহির করবার সময় ওঁর এতটুকু খেয়াল থাকে না যে শ্রোতাটি কে এবং সে ওঁর বক্তব্যের কতো শতাংশ কানে তুলছে?

কাজেই, উনি আবার ওঁর বিগলিত মূল্যবান অধ্যায়টি খুলে না বসেন তাই, ওঁকে নমস্কার জানিয়ে একটা কাল্পনিক কাজের অছিলায় মানে মানে কেটে পড়লাম। এবং সোজা নিজের ঘরে ঢুকে গেলাম।

ঘর খালি। জ্যোতি এখনো ফেরেনি। অতএব ওর অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে সচেষ্ট হলাম। কারণ: ওর টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো বই-খাতাগুলো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। বলাবাহুল্য এক গাদা ভূগোলের বই। একটা খাতায় নোট্স লেখা। খাতা-পত্রের নীচে মারাঠীর একখানা বি. এ. গাইড।

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে গাইডের পাতা ওল্টাতে লাগলাম। হঠাৎ একখানা অন্তর্দেশীয় পত্র চোখে পড়লো। মনে হলো—নির্ঘাৎ প্রেমপত্র। খুললাম। লিপি দেবনাগরী। ভাষা মারাঠি। ইতি-র জেরে লেখা—তুসিচ আই। মা'র চিঠি। মা'র চিঠিখানা অতিযত্নে রক্ষিত দেখে বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হলো না—জ্যোতিটা নিতান্ত একটি পশু, একটি 'গুরুনো' মেয়ে।

এতেও যখন সময়ের পাহাড়টাকে কাটা গেলো না, তখন জ্যোতির এ্যালবামখানা খুলে বসলাম। একখানা ফটোগ্রাফ বেরুলো। ক্ষণিকের জন্যে আমাকে স্তব্ধ হতে হলো। জ্যোতির সঙ্গে একটি ছেলে বা বয়স্ক পুরুষ। নববিবাহিত দম্পতির আক্ষিকে তোলা ফটোর পেছনে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা: মধুর মিলন—দিলীপ।··· ঠিক সেই মুহূর্তে সাদামাটা জ্যোতি আমার মনের পর্দায় বহু বর্ণ-বাহার নিয়ে ঝলমলিয়ে উঠলো। একটা রহস্যময় জীবন···একটা সার্থক দিন যাপনের শতক্রিয়া···

শনিবার।

অথচ কুমারের চিঠির পাত্তা নেই। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। চিঠি না আসার অর্থ রোববারটাও মাটি।

মাথায় চিন্তা ভর করলো নির্ঘাৎ আড্ডাবাজ বন্ধু বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছে ও।

রাগে গজ গজ করতে করতে ডাইনিং হলে ঢুকলাম।

রোববার সকালে ঘুম থেকে উঠতে-না উঠতেই জ্যোতি আমাদের দুজনকার জল খাবার আমাদের ঘরেই আনিয়ে দিলো। আমি চানটান না করে শুয়ে-শুয়েই চা খেলাম। এবং খোলা চোখেই স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করলাম। জ্যোতি ক্ষিপ্রহাতে তৈরি হতে লাগলো। স্বপ্নের পরিবর্তে আমার চোখের তারায় চিন্তার ছায়া পড়লো—কুমার বেচারী কোথায় আছে···কী খাচ্ছে···চা সিগারেটেই তীব্র ক্ষিদে মেটাতে হচ্ছে না তো আবার···ওর সে ইন্টারভিউটাই বা কী হলো···

মনে হলো—স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে!

ঠিক তখুনি চাপরাসী এসে খবর দিলো—'দিদিমণি, ভিজিটার।'

সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বসে থাকা সত্ত্বেও এতো সকালে সেজেগুজে নিচে যেতে মন চাইলো না। কেন না,

খানিকক্ষণ ধরে একটানা মস্তিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলছিলাম।···শরীরের সঙ্গে সঙ্গে অথবা মস্তিষ্কটাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে না কেন?

অতঃপর চোখে-মুখে প্রচুর রাগের ছোঁয়া মেখে দোমড়ানো-মোচড়ানো ড্রিপিং গাউনেই নিচে নেমে এলাম।

ডিজিটর্স রুমে কৃষ্ণ কড়কড়ে তাজা-টাটকা মুখে বসে। আমার বেশবাস দেখে হতাশা জড়ানো গলায় বলে উঠলো—'এ কী, আপনি এখনো ঘুম থেকে উঠে চানই সারতে পারেননি! আর আমি 'অ কড়স'-এর মর্নিং শোয়ের টিকিট নিয়ে হাজির।'

আমি ঘড়ির পানে তাকিয়ে বিরাগ' গলায় বললাম—'তাহলে এখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছো কেন? এতোক্ষণে পিকচার শুরু হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ আহত চোখে আমার দিকে তাকালো—'টিকিট একখানা নয়—এক জোড়া। আপনাকেও যেতে হবে।'

ভেতো গলায় বললাম—'শোনো, সকাল দশটায় ডাক্তারের চেম্বার কিংবা অফিসে যেতে আমি রাজি—কিন্তু, সিনেমায় নয়।'

—'অর্থাৎ একখানা টিকিট নষ্ট?'

—'শোনো কে. কে. আইডিয়াল ব্যাচেলাররা বৌদি অথবা দিদিদের পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে না—জানো তো?'

কৃষ্ণ হেসে উঠলো। তারপর গলায় শোকের সুর টেনে আনলো—'প্লিজ, আজকের দিনটা শুধু..!'

সুতরাং চানের আর সময় পাওয়া গেলো না। তাড়াহুড়ো করে বেরুতে বেরুতেও পৌনে এগারোটা বেজে গেলো।

কৃষ্ণ রীতিমতো চুপসে গেলো।

মন লাগিয়ে পুরো ফিল্ম দেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। এক জোড়া নায়ক। এক জোড়া নায়িকা। দুজোড়া ন্যাকামো। সেই সঙ্গে শারীরিক-মানসিক এবং অতি শারীরিক সম্পর্ক সাধনের আকাশ-আকাশ প্রচেষ্টা।

অস্বাভাবিক-অপ্রাকৃতিক সম্পর্ক কখনোই আমার মনে দাগ কাটে না। তা যতোই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত করা হোক না কেন!

আমার মাথা টনটন করে উঠলো।

ধরা গলায় বললাম—'দুটো সারিডন ট্যাবলেট কিংবা এক কাপ চা পেলে হতো!'

কৃষ্ণ বললো—ছবিটা শেষ হোক, আমরা মোক্যাম্বোতে লাঞ্চ নেবো!'

আমি ককিয়ে উঠলাম—'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

আমরা উঠে গুরডোন-এ এলাম। কৃষ্ণর চোখে-মুখে মুঠো মুঠো ব্যর্থতার গ্লানি।

অতঃপর ক্ষিপ্রহাতে পার্স খুলে এ্যাস্পিরিন বার করে চায়ের সঙ্গে গিললাম। দু হাতে চোয়ালের পাশ দুটো চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। এ্যাস্পিরিন-এর প্রতিক্রিয়া শুরু হতেই লক্ষ্য করলাম—কৃষ্ণ আমার সামনে বাংলা পাঁচ-এর মতো মুখ করে বসে রয়েছে।···ঠিক সেই মুহূর্তে বেচারীর জন্যে দারুণ মায়া হলো।

—'এখান থেকে আমি সোজা হোস্টেলে চলে যাবো। তুমি গিয়ে পিছচান রাখো—কে. কে.।'

—'আমি তো ভাবছিলাম—আপনাকে আবার চলপিটাল অবধি নিয়ে যেতে না হয়···

'তোমার হাসি খুশি ভরানো দিনটাকে অযথা গোলমাল করে দেবার জন্যে আমি দুঃখিত—কে. কে.

অতঃপর প্রস্থান।

হোস্টেলে পৌঁছে বিছানায় গা এলিয়ে নিজের মনে বললো কে. টা আগে যতোটা কো-অপারেটিভ ছিলো, এখন আর ততোটা নেই।'

তারপর কাপড় চোপড় ছেড়ে ফ্রেশ হতে হতে মনে হলো—আমিও ইদানীং ততোটা কো-অপারেটিভ নেই। এটা হয়তো বয়েসেরই ধর্ম, যা ক্রমে ক্রমে দেহ-মনের সবটুকু নমনীয়তা নিঃশেষ করে দেয়।

এখন আর আগের মতো টুকরো টুকরো কথা কিংবা ঘটনা মনে আনন্দ—অনুভূতি জাগে না। বরং যেন্তাজ বিগড়ে যায়। বিশেষ করে কুমার সংক্রান্ত ব্যাপারে। অথচ—কী আশ্চর্য, বিয়ের আগে এই সব টুকরো কথা, অসংলগ্ন ঘটনাবলী আমাকে মহামুগ্ধ করে রাখতো। যেমন—সিগারেট কখনো পুরোপুরিভাবে খেতো না ও। গোটা তিন-চারেক টানের পরই সিগারেটের জলন্ত মুখটাকে থেঁৎলে দিয়ে এদিক সেদিক ছুঁড়ে মারতো। চায়ের প্রথম চুমুকটাই গরম-গরম খেয়ে বাকীটুকু সরবৎ বানিয়ে খেতো। ওর জুতো জোড়া না করতো নিজে পালিশ, না আমাকে করতে দিতো। রং চটে যেতেই আরেক জোড়া নতুন জুতো এনে হাজির করতো।

আমার ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—কুমার যদি পূর্বাহ্নেই এতোটা অমিতব্যয়ী না হয়ে পড়তো, তাহলে আমার ট্যাঁক আজ গভের মাঠের শূন্যতার পরিপূর্ণ থাকতো না।

ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নতুন করে আবার আমার মধ্যে একটা আশঙ্কার পোঁচ বুলিয়ে দিলো ভিসে ডিসেঁ করে যাওয়া সময় আজকে জরুরী ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি খইভাজা ধানের মতো ছটফট করতে লাগলাম। হুঁ, বাস্তব বা বর্তমানের প্রতি আমাকে আরো বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিলো। প্রেম-প্রকরণ এবং প্রেমীর প্রতি আরো বেশি পরিমাণে সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন ছিলো আমার।

অথচ, তখন আমি জীবনের আর্থিক দিকটাকে বড়ো করে দেখতে চাই

একটা স্থির সিদ্ধান্ত মনের খাঁজে খাঁজে ভরে নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। চান করলাম। তারপর সবচে সুসজ্জিত হয়ে কৃষ্ণকে ফোন করবার উদ্দেশ্যে নিচে নামলাম ...যেন ফোনে টেলিভিশন বসানো রয়েছে।

কে. কে. মেসে অনুপস্থিত। চোখে-মুখে একরাশ হতাশা মেখে ফিরে আসতে বললো আমাকে। বিজয়-অভিযানে বেরিয়ে ছিলাম। কাজেই এমন 'দারুণভাবে' সজ্জিত হবার পর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে নিজের এক-ঘেয়েমি জড়ানো কুঠুরিটায় ফিরে আসতেও মন সায় দিলো না। অতএব—কয়েক মুহূর্ত করিডোরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজিটার্সদের দেখতে লাগলাম নির্লিপ্ত চোখে। তারপর বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। এবং নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে কোলাবাগানী একটা বাসে চেপে বসলাম। মুহূর্ত কয়েক জানালা দিয়ে অনাবিল নিসর্গ শোভা প্রত্যক্ষ করবার পর বুঝতে পারলাম—পাশের সহযাত্রীটি নিশ্চল-নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই···।

এবং বিস্মিতভাবে শুনতেও হলো—'বেবি, উইল ইউ হ্যাভ ডিনার উইথ মী, ফিফটি রুপিজ...

একজন প্রৌঢ়—বলাই বাহুল্য—পার্শী ভদ্রলোক। পরনের গলাবন্ধ কোটটি অত্যন্ত ঢিলে এবং যথেষ্ট পুরনো।

তারপর সহযাত্রীটির প্রচ্ছন্ন সঙ্কেত সম্পর্কে সচেতন হতেই আঁৎকে উঠলাম আমি—নো শাট আপ!' বলতে বলতেই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। এবং পরবর্তী স্টপেই বাস থেকে ভূমিষ্ঠ হলাম।

নিতান্ত অচেনা অজানা বাস স্টপে দাঁড়াতেই যুগপৎ নিশ্চিন্তি এবং আনন্দ ঘিরে ধরলো। ইস, যদি কোনো বিপদ টিপদ হতো.....'

হঠাৎই ছোট্ট অক্ষরটাই আমার চোখে গোঁসার এবং কুৎসিত হয়ে দেখা দিল

কে. কে. নতুন ক্যামেরা কিনেছে। ফোনে জানালো—'আজ দুপুরে আমরা কমলা নেহেরু পার্কে যাবো। পুরো রিলটা খতম করতে হবে।'

সত্যি আজকে আমি প্রচণ্ড খুশি। খুশির কারণ অবিশ্যি অন্য। কুমারের চিঠি এসেছে। ইউনিভার্সিটিতে লেকচারারশিপ পেয়েছে বোম্বে তারিখে জয়েন করছে। লিখেছে চিঠি পেয়েই যেখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে চলে এসো। দেরি কোরো না যেন। রেজিগনেশান লেটার দিল্লীতে এসে ডাকে পাঠালেও চলবে।..... হু, এই মুহূর্তে তোমাকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করছে.....'

চিঠি! না, চিঠি নয়-এক ঝোড়া ব্যাকুল দিঠি।

সে ব্যাকুলতা আমাকেও উৎকণ্ঠিত করে তুললো। অথচ বিকেল পর্যন্ত গাড়ী নেই। অন্ততঃ ভোরের ট্রেনে। কাজেই আজকে সারাটা দিনের মধ্যে যাবতীয় কাজকর্ম সেরে ফেলতে হবে। তার ওপর আবার কুমার আমার চেতনার কোষে কোষে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে যে কিছুই মাথায় খেলছে না।

বললাম—আজকে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব নয় ভাই। কালকেই দিল্লী চলে যাচ্ছি।

কৃষ্ণ বিশ্বাসই করতে চাইলো না।

'কিন্তু, আজকে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। নইলে ক্যামেরা এখুনি ভেঙ্গে ফেলবো!'

অগত্যা বলতে হলো—'শোনো,টুরিষ্টদের মতো ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে আবার সটান হোস্টেলে হাজির হয়ো আমিই তোমাদের অফিসের বাইরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো—কেমন?'

আজকেই আবার স্টাফ মিটিংয়ের ঝামেলা ছিলো। মিটিং সেরে সোজা কৃষ্ণদের অফিসে হাজির হলাম। ও বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

ট্যাক্সিতে বসবার আগেই ও অবশ্য হতাশাসক বলে বসলো—'আপনি হোস্টেলে গিয়ে যদি চেঞ্জ হতে চান, তাহলে আগে হোস্টেলে চলুন।'

পরক্ষণেই বুঝে ফেললাম—কৃষ্ণ কী বলতে চাইছে। পরনে আমার শাদা খাদী শাদা ব্লাউজ।

গলার নিম্নদেশ ঢেকে বললাম—'ঠিক আছে বৈধব্য বেশ বলতে হবে না। তোমাকে আমার ছবি না তুললেও চলবে।

'পান থেকে চুন খসলেই আপনি খেপে যান কেন বৌদি? অনেকটা চাপর ঘুগের মতো তখনি গলায় বলে উঠলো কে. কে.।

কমলা নেহেরু পার্কের যে জায়গাগুলোতে অগুনতি লোক অগুনতি লোকের ছবি তোলে আমরাও সেই সেই জায়গায় গিয়ে পরস্পর পরস্পরের ছবি তুললাম। যথা—রেলিঙে হেলান দিয়ে ফোয়ারার সামনে এবং ঘটকোন বিশিষ্ট বারান্দার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে।

ফিল্মটা যেন দ্রৌপদীর কাপড় দেখই হচ্ছিলো না।

আমি ঘাসের ভালুক উট এবং হরিণের পর্যন্ত ছবি নিলাম। কৃষ্ণ গোমড়া মুখে আমার হাত থেকে ক্যামেরাটা একরকম ছিনিয়ে নিলো।

বললাম—'কে. কে. আমাকে এক্ষুনি ফিরে গিয়ে মালপত্র গোছগাছ করতে হবে।'

বিমর্ষ গলায় উত্তর এল—'চলুন না বাজ-এ গিয়ে কফি খেয়ে আসি। আবার কবে দেখা হবে—কে জানে!'

আমার কিন্তু ওর এই ছেলেমি খুব বাজে লাগলো। আমার উপোষী জীবনে আজকের দিনটা যে গুরুত্বপূর্ণ কতো আশাব্যঞ্জক তা উল্লুকটা কি করে বুঝবে।

'বাজ'-এর ছাদ থেকে যতো দূর দৃষ্টি যায় শুধু বিস্তার শুধু প্রসারণ

অথচ, আমার উৎকণ্ঠিত মন প্রাণ সে বিস্তারে বিস্তীর্ণ হতে পারছে না।

বড়ো বড়ো চুমুকে যান্ত্রিকভাবেই কফির কাপে পুনাতা ভরে দিলাম।

অনেকক্ষণ ধরে প্রায় নিশ্চুপই ছিলাম আমি কাজেই কৃষ্ণ না বলে পারলো না—'অমন করে গোমড়া বসে থাকার ঊনতম কারণের গুরুতাটুকু জানতে পারি কি?

'দৃষ্টি তোলার জন্য।' বললাম—'শোনো কৃষ্ণনো আমার ওপর এ ধরনের কমেন্ট করবে না—বুঝলে? আমি মাইণ্ড করি।'

'অথচ আমি কিন্তু মাইণ্ড করছি না—যদিও সেই তখন থেকে আপনি এমন গম্ভীর ভাবে বসে রয়েছেন যেন ছবি নয় আপনার একদ-রে নিচ্ছি।'

'তুমি ভুল লোকের সঙ্গে এসেছো। অফিসের মিস-টাইপিস্টদের কারো একজনের সঙ্গে এলে তোমার পক্ষে সুবিধা হতো।'

—'এটা কী চ্যালেঞ্জ নাকি?'

—'চ্যালেঞ্জ এর পেছনে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কোনো সঙ্গত কারণ দেখছি না।

-'ভাবছি আপনার ক্যামেরাটা আজকে দামে বেচে দিই।'

—তুমি নাম্বার ওয়ান মূর্খ।'

কৃষ্ণ গুরুতরভাবে আহত হলো-'বৌদি জানি না আজকেই আমাদের শেষ দেখাশোনা কি না। কাজেই আমাকে সিরিয়াসলি নিতে পারেন না?'

আমি খিলখিল করে হেসে উঠলাম। 'সিরিয়াসলি তো উপনিষদ কিংবা অসুখ-বিসুখের কথাই ভাবা হয়ে থাকে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে একটা আকাশ ছোঁয়া অহঙ্কার মাথা চাড়া দিলো-ইস ছেলেটাকে কতো সহজে হাসতে পারি—কতো সহজে কাঁদাতে পারি আমি...।

বিকালের পড়ন্ত রোদ ক্রমে ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে এলো। সূর্য যেন অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাত্রদাহ মেটাতে ব্যস্ত।

অমরুশতক থেকে। অনুবাদ। শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী

চরণপতনপ্রত্যাখ্যান প্রসাদ পরাঙ্মুখে
নিভৃতকিতবাচারেত্যুক্তে কৃষা পরুষীকৃতে।
ব্রজতি রমণে নিঃসম্ভোগৈঃ স্তনার্পিতহেতুতা
নয়নসলিলচ্ছন্না দৃষ্টিঃ সখীষু নিপাতিতা।

লুটিয়েছিল পায়
তবু ফিরালে তারে হায়!
আর—
বিমুখ হ'ল মনের প্রীতি তার।
রুষিয়া হায় কহিলে যারে—
"লুকিয়ে কেন্নো কুকাজ করে",
তার—
রোষে পরুষ রুক্ষ হ'ল তার!
বন্ধু যখন ফিরিয়া গেল—
দীর্ঘশ্বাস বৃথাই ফেল!
এখন রুদ্ধ হলে
নয়ন জলে
বৃথাই আঁখি ফেরাও যত সখীর দিকে,
দুহাত রেখে তোমার বুকে!

সোনালী জ্বালা ॥ নীলমণি ফুকন ॥ অনুবাদ ॥ সনন্ত তাঁতি

[একালের অসমীয়া কবিদের মধ্যে কবি নীলমণি ফুকন একটি বিতর্কিত নাম। অনেকের মতে শ্রীফুকন নির্জনতার কবি। তিনি নির্জনতা ভালোবাসেন। আর ভালো বাসেন বলেই গণসংগ্রামের প্রতি তাঁর অনীহা। অবশ্য কারো কারো মতে শ্রীফুকন অসমীয়া কবিতার ক্ষেত্রে যে নতুনত্ব এনেছেন তা আর কেউ আনতে পারেননি। শ্রীফুকনের মতে,—আমি যা উপলব্ধি করি তাই আমার কবিতায় প্রকাশ পায়। উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীফুকন এ বছর Assam Publication Board Award পেয়েছেন তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'কাঁইট গোলাপ আরু কাঁইট' এর জন্য। বর্তমান কবিতাটি তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ "আরু কি নৈঃশব্দ"-এর 'সোনালী জ্বালা'র হুবহু অনুবাদ।]

একটি শিশুর অগ্নি ঝলসানো মুখ
মুখের কী সেই
সোনালী জ্বালা

জানালার আয়না ভাঙ্গা
আয়নার রক্ত
আয়নার চাঁদ

রাতের ঘণ্টা ধ্বনিতে
বিদীর্ণ বসুধা
আরো কী নৈঃশব্দ

আরো কী নৈঃশব্দ
নীল কী বহুদূর স্তব্ধতে
মর্মরিত সন্ত কণা

মানুষের মুখে মুখে
মুখের কী সেই
সোনালী জ্বালা

আয়নার চাঁদ
ভাঙ্গা
লাল

দু'টি কবিতা ॥ মহাদেব হাঁসদা ॥ অনুবাদ ॥ মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

[মহাদেব হাঁসদা পুরুলিয়া জেলার প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন তরুণ সাঁওতালি কবি। সাঁওতালী ভাষায় পরীক্ষা নীরিক্ষামূলক কবিতা রচনা করে কবি ইতিমধ্যেই বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'তেতরে' নামক একটি উচ্চমানের সাঁওতালী মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন।]

॥ রূপালী চাঁদের কান্না ॥

রঙ চটে যাওয়া সময়ের পাতা বিবর্ণ হয়। মনে জাগুন
মশাল জ্বালায়, রক্তে দহন—ধমনীতে জ্বলে নীল আগুন
আমি তো চেয়েছি মৃত্যুর সাঁকো পার হয়ে রাঙা স্বপ্নকে
রাত্রির শেষে আলোর কবিতা—সূর্যমুখী সে লয়কে।
পাইনি কিছুই। ব্যর্থ সকলি। মনে ওঠে বহু দীর্ঘশ্বাস
যৌবনে কাঁদে বৃদ্ধ যযাতি—চোখ মেলে চায় নীল আকাশ।
তৃতীয় নয়নে নেইকো দৃষ্টি—সৃষ্টির বুকে মরণ ফাঁদ
ধ্বংসের কোন ইঙ্গিতে আজ কান্না মরার রূপালী চাঁদ?

॥ ভালোবাসা আগুনের ঘর ॥

সে গিয়েছে বহু দূরে—রক্তের ভিতরে পদধ্বনি
বাজতে থাকে, ভালো লাগা চিত্রিত মধ্যাহ্নগুলি
চুরি করে গোপন দরজা দিয়ে চলে গেল হাওয়া
সঠিক ঠিকানা কেউ মুখ খুলে বলতেই পারলো না।
সে জানে রহস্যময় সৃষ্টির আসল কথাগুলি
আদি জন্মস্থানে ফির উৎস কেন্দ্রে তাই ফিরে যায়
স্মৃতিরা বেইমান বহু দূর শয্যায় শুয়ে শুয়ে
পিপাসার জল চায়—নৈঃশব্দের অন্তরঙ্গ সুখ।
সে গিয়েছে বোধ থেকে বোধির গভীর দেশে চলে
বোধিদ্রুমে ছায়া নামে—চতুর্দিকে মোহিনী আড়াল
ঘুঘুডাকা অলস মধ্যাহ্নে কোন গোপন নায়ক
বুকে তার পুষে রাখে ভালবাসা আগুনের ঘর!

অনাথের অশ্রু ॥ পরভীন ইতেশামী ॥ অনুবাদ ॥ আবদুস সাত্তার

[আধুনিক ফারসী সাহিত্যে পারভীন ইতেশামী এক অনন্যা নাম। মহিলাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি। নারী প্রগতি এবং সমাজের বিশেষ দিকের প্রতি তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত সোচ্চার। আলোচ্য কবিতাটি তাঁর 'অঁাস্থ-ই ইয়াতিম' কবিতার অনুবাদ।]

রাস্তা দিয়ে রাজা আসে যায়
হাজার জনতা তাকে সালাম জানায়।
সে এক অনাথ বলে, 'রাজার মাথায়
অমন মুক্তোর মতো কি সে চমকায়!'
অনাজন স্বর তোলে, 'বলতে পারি না।
তবে জানি মূল্যবান বস্তু এক, তাই মনে কি না!'
বৃদ্ধা এক ত্রস্ত বেগে ছুটে এসে বলে,
'ওটাতো আমার অশ্রু, তোমাদের রক্তের কণিকা
সমস্ত জমাট হয়ে রাজার পাগড়ী মাঝে জ্বলে।'

যেমন ভেড়ার দলে বাঘ এসে ভেড়া শেষ করে
আমাদের সেই দশা, রাজার খপ্পরে আছি পড়ে।
ধার্মিক ইমাম যদি জমিন ও ঘোড়া ক্রয় করে
নিছক তাকাত ছাড়া কি বলবো তাকে!
এবং সে রাজা যদি দেশের সম্পদ লুট করে
নিছক ভিক্ষুক ছাড়া কি বলবো তাকে।

অনাথের অশ্রু পানে তাকাও পরম কৌতূহলে
দেখবে সে অশ্রু নয়, রাজার মানিক শুধু জ্বলে!

ভালবাসার সবুজ দ্বীপ ॥ অগস্তিনো নেটো ॥ অনুবাদ ॥ রেজাউল হক মানিক

[এ্যাঙ্গোলার প্রখ্যাত কবি অগস্তিনো নেটোর কবিতের উৎস আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষ। ১৯৬১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী রাজধানী লুয়াণ্ডার কারাগার আক্রমনের মাধ্যমে এ্যাঙ্গোলায় বিপ্লব আরম্ভ হয়। বর্তমানে এম. পি. এল. এর প্রেসিডেন্ট অগস্তিনো নেটো কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও পেশায় তিনি একজন ডাক্তার। মূলভাষা পর্তুগীজ থেকে কবিতাটি অনুবাদ করতে সাহায্য করছেন না সমা আক্তার মুক্তা।]

সময় ফুরিয়ে গেলে আটলান্টিকও
ফিরিয়ে দেয় মৃত মানুষের শব
সাদা ফুলের ফেনা জড়িয়ে
লাঞ্ছিতের অপ রসীম ঘৃনায়
মৃতের জমাট রক্ত টেনে তোলে
ঢেউয়ের উপর
বেলাভূমি ছেয়ে যায় কাক আর
শেয়ালের পাশবিক ক্ষুধায়
বালির উপর পড়ে থাকে ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ
শতাব্দীর নির্মম স্তীতি দগ্ধ করে দেশ
জন্ম নেয় ক্রীতদাস—'কল্পিত সবুজভূমি'
শিশুরা অবোধ বিশ্বাসে গড়ে তোলে আশার বসতি
সমুদ্রের মৃত মানুষের শব
ভালবাসা ও ঘৃণার রক্তরঞ্জিত লবণাক্ত জল
কেঁপে উঠে অপমানে ও এ ভবাদে
আমাদের চোখের আগুন
শিরায় শিরায় ছোবল মারে জীবনে মৃত্যুতে
আমরা মৃতদের সৎকার করি ভালবাসার বিজয়ী উল্লাসে এবং পবিত্র স্বীকৃতি দিই
যারা বর্তমানকে বিসর্জন দিল
আমাদের অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য

এখনো যা ঝড়ের মুখে সঙ্কটের তালে
রক্তরাগ জলে ভাসে
আমাদের 'ভানটোনের' পবিত্র মাটি
চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে
ভালবাসার সবুজ দ্বীপ হয়ে উঠে ॥

চৈনিক কবিতা ॥ অনুবাদ ॥ অতুল কুমার দত্ত

[ছোট ছোট এই কবিতাগুলি সুপ্রাচীন চীনের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। ভাবঘন, শব্দবাহুল্য বর্জিত ও জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষা সংপৃক্ত এই কাব্য কণিকাগুলিতে প্রতিবাদ ও প্রেম দুটোই আছে।]

॥ রাজ প্রাসাদের গান ॥

পাই চু-ই

৭৭২-৮৪৬ খ্রী :

অঙ্গ তার ঘুমিয়েছে, চোখ হতে স্বপ্ন ঘুছে গেছে,
রাতের হাওয়ায় আসা অন্যদের গান শুধু শোনে,
সব প্রেম হারিয়েছে, আপনার রূপ নিয়ে একা,
দুরন্তিত উপাধানে ভর দিয়ে রাত ভোর হয়।

॥ মরকত-শ্রুত্র সোপানে দীর্ঘশ্বাস ॥

লি-পো

৭০৫-৭৬২ খ্রী:

মরকত শ্রুত্র তার সোপান যে শিশিরে শীতল
বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে—
রেশমী জুতোর তলা তার ভিজে গেছে,.....
স্ফটিক খার্শী দিয়ে হেমন্ত জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে
রুদ্ধ জানালার পাশে কেন সে এখনো প্রতীক্ষায় ?

॥ ঘরে ফেরা ॥

হে চিহ্-চ্যাঙ

৬৫৯-৭৪৪ খ্রী:

ছেড়েছি ঘর যখন তরুণ, ফিরেছি যখন বৃদ্ধ,
আসের মতই বলছি কথা, বিরল-কেশ শির ;
সন্তানেরা আমায় দেখে চিনতে অসমর্থ,
বলছে হেসে, "অচেনা লোক, আসছ কোথা থেকে ?"

॥ খবর ॥

ওয়াং ওয়েই

৬৯১-৭৪৯ খ্রী:

আরে, তুমি আমার গাঁ থেকে এসেছ,
বলো-না, গাঁয়ের কী খবর ?
আমার বাড়ির রেশমী পর্দার পাশ দিয়ে যখন আসছিলে
গ্রাম তার প্রথম শীতল ফুলের পাপড়িগুলি কি খুলছিল ?

দশ বাই আট ॥ কর্তার সিং দুগ্‌গল ॥ অনুবাদ ॥ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

[কর্তার সিং দুগ্‌গল পাঞ্জাবী সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক। 'ইক ছিট চানন দী' গল্প সংগ্রহের জন্য ১৯৬৭ সালে সাহিত্য একাদেমীর পুরস্কার পান। আলোচ্য গল্পটি নেওয়া হয়েছে 'সভে শাখী ওয়াল সদাইনি ১৯৬৬, থেকে।]

টিপয়ের উপর খোলা পড়ে ছিল বাড়ির নক্‌শাটা। সেদিকে ইশারা করে মিসেস মালিক আরও একবার বললেন 'এই কামরাটা কিন্তু দশ বাই আট ফুট হবে বলে দিচ্ছি।' এই নিয়ে পরপর তিন বার বলা হল কথাটি। কিন্তু কে জানে কেন তাঁর কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপই করছে না—না তাঁর স্বামী, না ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক।.....

মিসেস মালিক তাঁর নিজস্ব বাড়ী তৈরী করছেন। দিল্লীর সব চেয়ে জমজমাট অঞ্চলে তাঁর প্লট। সম্প্রতি যখন তাঁর স্বামীর দিল্লীতে পোস্টিং হয় ওঁরা দুজনে মিলে স্থির করে ফেলেন—যেমন করে হোক, চার পাঁচ মাসের মধ্যে বাড়িটা শেষ করা চাই।

মিসেস মালিক স্বামীকে বোঝান-'ভাখো, তোমার তো বদলির চাকরী। আজ এখানে কাল সেখানে। কোথাও একটু থিতু হয়ে বসেছ কি, হুট্ করে হুকুম এল ট্রান্সফারের। আট বছর বিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ো আরেক শহরের দিকে। ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে, আর হতে দেব না। আমি ভাবছি কী জানো, বাড়িটা তৈরী হয়ে গেলে আমরা সব দিল্লীতেই থাকব। ছেলে মেয়ে তো বড় হয়েছে, দিল্লীতে একা থাকার অভ্যেসটা কিসের? তাছাড়া মাও তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

মা অর্থাৎ মিসেস মালিকের শাশুড়ী। অনেক ভেবে চিন্তে স্ত্রীর মতে মত দেওয়াই মালিক সাহেব শ্রেয় বিবেচনা করলেন। মিসেস মালিক আবারও বললেন, 'এই কামরাটি কিন্তু দশ বাই আট হবে বলে দিচ্ছি।'

ইতিমধ্যে পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠতে মালিক সাহেব উঠে চলে গেলেন। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক গৃহকর্ত্রীকে বোঝাতে চাইলেন, 'এটা তো স্টোর রুম···'।

'তা ঠিক। আমি বলছিলাম কী এই কামরাটা আপাতত মায়ের ঘরেই থাকবে। তারপরে সময় মতো এটাকে স্টোর রুম করে নেব।'

ইঞ্জিনিয়ার মিসেস মালিকের মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন তাঁর কথাটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না।

'আমি বলছিলাম কী মা এখনকার মতো এই কামরাতেই শোবেন, তার পরে·····উনি তো আর বেশি দিন··· থাকে···।'

টেলিফোন সেরে মালিক সাহেব ইতিমধ্যেই এসে গেলেন। স্ত্রীর পরামর্শটা মন্দ লাগছিল না তাঁর। স্টোর

রুম একটু বড়োসড়ো হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জিনিসপত্তরগুলো বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে রাখা যায়। তাছাড়া মাঝেমধ্যে ঝাড় পোঁছ করাও খুব সুবিধে!

সুতরাং স্থির হল ছেলের শোবার ঘরের লাগোয়া বাথরুমের এপাশের দরজাটি বন্ধ করে আট মাপেই তৈরী করা হোক। অবশ্য উঠোনটা কয়েক ফুট ছোট হয়ে যাবে। হোক, তাতে কিছু ক্ষতি নেই।

বাকী সব ব্যবস্থা আগে থেকেই নক্‌শার মধ্যে প্রস্তুত করা ছিল। কাজেই আর কাল বিলম্ব না করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নক্‌শাটা যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বেশ মনের মতো করে মিসেস মালিক বাড়িটি তৈরী করতে লাগলেন। গরমের দিন। সারাটা দুপুর একটি ছাতা সম্বল করে মিস্ত্রী মজুরদের পিছনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। এমনও হয়েছে কয়েকদিন সে মেয়ে মজুরের মধ্যে কেউ হয়তো আসে নি। মিসেস মালিক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সিল্কের দামী শাড়ী খানা তুলে রেখে ব্লাউজ পেটিকোট পরা অবস্থায় মজুরদের সঙ্গে কাজে লেগে গেছেন। ভোরবেলায় তিনি কাজের জায়গায় এসে হাজির হতেন সকলের আগে, আর সন্ধ্যাবেলায় সবাই বাড়ি চলে যাওয়ার পরে ফিরতেন। খাটতে খাটতে মিসেস মালিক যেন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাচ্ছিলেন।

অবশেষে তৈরী হল তাঁর সখের বাড়ীখানা। কোন্ কামরাটি কার সে সব আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। আর ফার্নিচার? মিসেস মালিকের স্পষ্ট কথা—নতুন বাড়ীতে পুরানো আসবাবপত্রের ছিটে ফোঁটাও তিনি ঢুকতে দেবেন না।

বাড়ী তৈরী করে গৃহপ্রবেশেরও সুযোগ হল না। সরকার ইতিমধ্যে রিকুইজেশান করে বাড়িটি দখল করে নিলেন। খবরটা যখন মিসেস মালিকের কানে পৌঁছল মনে হল যেন তাঁর কাপড় চোপড়ে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবে বাড়ীভাড়ার মোটা অঙ্কটার কথা শুনে মনে মনে তিনি সরকারের সাত খুন মাপ করে দিলেন।

বাড়ী তৈরীর কাজে হাত দেওয়ার সময় থেকে পাড়া প্রতিবেশী অনেক বৌ-ঝির সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সে সব এখন চুলোয় গেল। নিজের তৈরী বাড়ীটি মনের মতো করে সাজাবার কত যে সাধ ছিল তাঁর, কিন্তু তা আর পূর্ণ হল না।

মালিক সাহেব আবার বদলি হলেন। মালিকগিন্নি এই বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে দিন রাত আর চোখের সামনে নিজের বাড়িটি দেখতে হবে না, দেখে দেখে তাঁর মনে আর ক্ষোভ জমা হবে না, আর মনের জ্বালা মেটাবার জন্য সরকারের দেওয়া মোটা অঙ্কের ভাড়ার টাকা নিয়েও সারাক্ষণ হিসেব করার দরকার নেই।

দিল্লী থেকে চলে যাওয়ার দিন মিসেস মালিক নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলেন—ভালই হল রাজধানীতে আমরা একটা সম্পত্তির মালিক হয়ে রইলাম। কিন্তু থেকে থেকে এই ভেবে তাঁর আপশোসও বড় কম হল, না যে এত শখ করে সব রকম সুযোগ সুবিধার কথা ভেবে যে বাড়িটা তৈরী হল, দুদিনও সেখানে বসবাসের সুযোগ মিললো না।

বদলির চাকরীর-চক্করে এ শহর থেকে সে শহর, সে শহর থেকে আরেক শহর—এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। মিসেস মালিকের মনে ওই একটি বাসনাই ছিল, নিজের বাড়ীতে বাস করার বাসনা, সেটি বুঝি আর পূর্ণ হবে না। সরকার তাঁদের বাড়ীখানায় কয়েকটি দপ্তর বসিয়েছেন। যাই হোক, এ একরকম ভালই হল যে প্রতিমাসের প্রথম তারিখটিতেই ভাড়ার মোট অঙ্কটা ব্যাঙ্কে এসে জমা হয়ে যায়। তখন যদি সরকার বাহাদুর দয়া করে বাড়িটি না নিতেন, তবে আজ এক ভাড়াটে, কাল অন্য ভাড়াটে, আজ এর এক বায়না, কাল ওর অন্য বায়না—কে বসে বসে এই সব ঝক্কি পোহাত বাপু?

বদলির চাকরে মিসেস মালিকের শাশুড়ী ঠাকুরুন একদিন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে যান। বুড়ো বয়স, আর কত কাল অপেক্ষা করবেন তিনি? মিসেস মালিকের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন ছেলের বিয়েটা শুধু বাকী। ওদিকে তাঁর স্বামীর রিটায়ার করার দিনও ঘনিয়ে এল। স্বামি স্ত্রী মিলে স্থির করলেন ইতিমধ্যেই ছেলের বিয়েটা দেওয়া দরকার।....

যথাকালে ঘরে পুত্রবধূ এসেছে। কিছুদিন পরে মালিক সাহেবও অবসর গ্রহণ করলেন। দিল্লীর বাড়িটি তখনও সরকারী হেফাজতে। মালিকদম্পতি আজকাল দিল্লীতেই থাকেন, ছেলের বাসায়। বাড়ীওয়ালা হয়েও এখন তাঁরা ভাগ্যচক্রে ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা।

মালিক সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে হেরে গেলেন। তারপরে একদিন জীবনযুদ্ধেই তাঁকে চরম পরাজয় বরণ করতে হল। কিন্তু ভাগ্যের কী করুণ পরিহাস! মৃত্যুর পরে তিন মাসও কাটে নি, সরকার তাঁর বাড়িটি ছেড়ে দিলেন।

মিসেস মালিকের পুত্রবধূটি পুরোদস্তুর হাল ফ্যাশনের মেয়ে। শাশুড়ীর চেয়ে সেই এখন বেশি ব্যাকুল নিজেদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। বাড়ীটা খালি হতে-না-হতেই সে নতুন বাড়ীতে মালপত্র সরাতে শুরু করে দিল। একদিন দুদিন, তিনদিন-ঠেলাগাড়ীর আনাগোনা চলতেই থাকল। ফার্নিচারের দোকান থেকে আসছে নতুন নতুন আসবাবপত্র। পুত্রবধূ নতুন বাড়িতে গিয়ে ঝাড়পোঁছ করিয়ে জিনিসপত্র ঘরদোর সাজাতেই ব্যস্ত।

স্থির হয়েছে সোমবার সকালে তাদের গৃহপ্রবেশ। সেদিন ভোরে উঠেই দেখা গেল বাইরে প্রবল বৃষ্টি। সকলেই অপেক্ষা করছে কখন বৃষ্টি থামবে। কিন্তু থামবার কোনো লক্ষণই নেই। এ যেন শ্রাবন মাসের অশ্রান্ত ধারা। গাড়ী নিয়ে ছেলে আপিসে বেরিয়ে গেল। কথা রইল সন্ধ্যার দিকে তারা বাড়ী বদল করবে। কিন্তু তখনও সেই অঝোরে বৃষ্টি। মিসেস মালিকের মুখে কেবল ওই একটি কথা 'আজ দিনটা বড় ভাল ছিলরে। গৃহপ্রবেশে আর দেরী করা উচিত হবে না। যেমন করে হোক আজই যাওয়া যাক।'

মায়ের কথামতো ছেলে ও বউ তৈরী হল। যে সব মালপত্র এখনও রয়ে গেছে সেগুলিও নিয়ে যেতে হবে। নিজেদের গাড়ী তো রয়েছেই, একখানা ট্যাক্সিও ডেকে আনা হল।

ঝিমঝিম ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছেই। গাড়ীর পিছনের সীটে বসে মিসেস মালিক মগ্ন হয়ে গেলেন পুরানো দিনের স্মৃতি চারণায়। মনে পড়ে গেল কত সাধ আহ্লাদ করে তিনি তৈরী করেছিলেন এই বাড়ীখানা! আর সেই সমস্ত দিন। কী যে সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে মজুরদের কাজের তদারক করতেন। এতটুকু ক্লান্তি ছিল না তাঁর। বাড়িটি তৈরী হয়ে গেলে কেমন সুন্দর দেখাবে তারই একটা রঙচঙে নক্সা বানিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। বাইরের বারন্দার থামের উপর আঁকা হয়েছে পরম সুন্দরী এক রমণীর মূর্তি, যেন কোনো পরী। ছবিটা প্রথম যেদিন দেখলেন সেদিন রাতে শুতে গিয়ে মিসেস মালিকের মনে হয়েছিল নক্সায় যার ছবি আঁকা হয়েছে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং তিনিই। তারপর থেকে কয়েকটা দিন বারবার তিনি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একবার সেই চিত্রিতা সুন্দরীর প্রতি, একবার আয়নায় প্রতিফলিত তাঁর নিজের মূর্তির প্রতি চেয়ে।

ছবিটি যে তাঁরই তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। কোনো একদিন তাঁর পুত্রবধূকে ছবিটি দেখাতে হবে।.... পুত্রবধূ? আজকালকার মেয়েরা আবার বধূ কিসের? ভাখো না, সামনের সীটে স্বামীর পাশে বসে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটুকরো আয়না বের ক'রে লিপস্টিক দিয়ে কেমন করে ঠোঁটে রং করছে! আরে বাবা, বাচ্ছু তো নিজেদের বাড়ীতে। স্নানও কর হয় নি, বৃষ্টিও হচ্ছে প্রচুর এই সময়ে এত সাজগোজের ঘটা কেন বাপু! এই হল আজকালকার মেয়ে। রাম, রাম। স্বামীর সঙ্গে গিটমিট গিটমিট ক'রে ইংরেজীতে কেমন কথা বলছে ভাখো।

মিসেস মালিক ওই ইংরিজীটাই যা শিখতে পারেন নি। আর সব কিছুই শিখেছিলেন। মাঝে মধ্যে এক-আধটু ড্রিঙ্কও করতেন। পার্টিতে, ক্লাবে যেতে হলে কতদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যায়? নাচটাও উনি শিখে নিয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে যেমন নেচেছেন, অন্য পুরুষের সঙ্গেও তেমনি নেচেছেন বৈকি!

কিন্তু তাঁর পুত্রবধূ যেন তাঁকেও দশ কদম পিছনে ফেলে দিয়েছে। আচ্ছা, সেই নানারঙের নকশাটাতে থামের উপরে আঁকা সেই পরমা সুন্দরী মেয়েটি তাঁর পুত্রবধূ নয় তো? না, না, তা কেমন ক'রে হবে? তখন তো তাঁর ছেলে কেবল ইস্কুলে পড়াশুনো করছে। কাজেই সেদিন ছেলের বৌ-এর ছবি ইভিনিংয়ারের স্বপ্নেও আসে নি। তবে একটা কথা। পাকা তরমুজের ভিতরটা যেমন টকটকে লাল হয়, সেই রঙেরই একটা শাড়ী তাঁর পুত্রবধূর পরনে। আর, যতদূর মনে পড়ে সেই থামে আঁকা মেয়েটির পরিধানেও ছিল একই রঙের শাড়ী। হ্যাঁ, ঠিক 'তরমুজী' রঙের। ওই রঙটা মিসেস মালিকের একেবারেই অপছন্দ। বড্ডো বেশি জমকালো। কেমন যেন আগুন-আগুন ভাব। আগুনতো লেগে গেছে এই নয়া জমানার কপালে!

...'তরমুজী' রঙের শাড়ী তো পরিস। বুঝবো যদি আমার মতো মেহনত করতে পারিস। এই তোর মতো বয়সেই তো বাড়িখানা তৈরী করেছিলাম। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক একখানা ক'রে ইঁট বসিয়েছি। রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, কাজের জায়গা থেকে নড়িনি কখনো। কতবার ইট নিয়ে নিয়ে মিস্ত্রীদের হাতে তুলে দিয়েছি। কতবার রবারের পাইপ দিয়ে নতুন সিমেন্ট করা দেয়ালে জল দিয়েছি। কোনোদিন কোনো মেয়ে-মজুর না এলে তার জায়গায় বসে বালি ঢেলে ঢেলে দিয়েছি...

ইতিমধ্যে বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটা থামল। এক পলকে লাফিয়ে পড়ে পুত্রবধূ গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো, একেবারে সেই থামটার গায়ে গা ঘেঁষে যেখানে নকশার মেয়েটি দাঁড়িয়ে। মিসেস মালিকের মনে হল কে যেন তাঁর বুকের মধ্যে আমূল ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। ফাঁকি দিয়েছে, ইভিনিংয়ার লোকটা তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে।

বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে ছেলের বৌ। খোঁপাটা তার তরমুজী রঙের শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢাকা। ট্যাক্সির ভিতর থেকে মালপত্র নামাবার জন্য চাকর বাকরদের কী সব হুকুম দিচ্ছে।

মালপত্র নামানো হলে পয়সা নিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা চলে গেল। মিসেস মালিক এখনও গাড়ীর মধ্যে বসে। যেন একটা গভীর কুয়োর গা বেয়ে বেয়ে ধীরে ধীরে তিনি নেমে যাচ্ছেন অতল অন্ধকারে।

ছেলে চলে গেল বাড়ির ভিতরে। চলে গেল বৌমা। চাকরবাকরও কেউ বাইরে রইল না। নিওন বাতির আলোয় অন্ধকার কামরাগুলো কেমন ঝলমল করে উঠলো। তিনি কিন্তু যেমন বসে ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন গাড়ীতে। শ্বাস নেওয়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত রইল না! ভয়-ব্যাকুল চোখে কী দেখছিলেন তিনিই জানেন।

এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কেটে গেল। ডাইনিং রুমে টেবিলের উপর খাবার সাজাতে গিয়ে মনে পড়ে যায় মিসেস মালিকের কথা।

'আরে, মা কোথায়? এই বলে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ছেলে বাইরে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল পুত্রবধূও। বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে সে, খোঁপাটা তার তরমুজী রঙের শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢাকা।

মোটর গাড়ীর দরজা খুলে ছেলে তার মাকে ধ'রে নামাল। মিসেস মালিক বললেন—'বুঝলি খোকা গাড়ীতে বসে বসে এই একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল।' ছেলে হাসতে হাসতে মাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

পুত্রবধূর উদ্দেশে শাশুড়ী বললেন—'আজ আর খাবনা কিছু। আমি এখন শুয়ে পড়ব।'

দশ-বাই-আট ঘরখানার দিকে ইশারা ক'রে বৌমা বলল—'আপনি তাহলে আপনার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। বিছানা পাতাই রয়েছে।' ছেলেও মায়ের হাত ধ'রে ধরা নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে এল।...

LIBRARY
UNIVERSITY OF

বিছানায় শোওয়া অবধি মিসেস মালিকের কানে একটি কথাই বার বার গুন গুন করছে—'আমি বলছিলাম কি এই কামরাটা আপাতত মায়ের জন্যই থাকবে। তার পরে সময় মতো এটাকে স্টোর রুম করে নেব'।

তাঁর মনে হচ্ছিল আর কতদিন তিনি অপেক্ষা করতে পারবেন। যে মানুষটির কাছে লক্ষবার তিনি বলেছিলেন—'তোমার জীবনে আমার জীবন, তোমার মৃত্যুতে আমার মৃত্যু, সেই মানুষটি তো কত আগেই চলে গেলেন।

'আমি বলছিলাম কি এই কামরাটা আপাতত মায়ের জন্যই থাক। তারপরে সময়মতো এটাকে স্টোর রুম ক'রে নেয়া যাবে'—এই কথাগুলো মিসেস মালিকের কানে এত জোরে জোরে বেজে উঠছে কেন?

কত কাল আর তিনি বসে থাকতে পারবেন? একে একে তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষাই তো পূর্ণ হল। বাকী রয়েছে মাত্র একটি, মরতে তো হবেই, কিন্তু আমি জানতে ইচ্ছে করে (ভগবান যদি করেন যেন মৃত্যুর পরে দেখার সুযোগ হয়)—তাঁর পুত্রবধূ এই কামরাটাকে স্টোর রুম ক'রে নেয় কিনা।

ডাইনিং রুম থেকে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। পুত্রবধূ বলছে—বুঝলে, বাড়িটা আর সব দিক থেকে ভালো, কেবল একটি স্টোর রুম নেই।'

কথাটা কানে যেতেই মিসেস মালিকের মনে হল তাঁর বুকের স্পন্দন বুঝি থেমে গেছে। মুহূর্তের জন্য কেমন একটা তীব্র আলোড়ন, তার পরেই ধীরে ধীরে চোখ দুটি বুজে এল।

নবলেখা অভিধান বলতে

এ. টি. দেব প্রণীত অভিধানই বোঝায়

'নববিধান' কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং ছাত্রছাত্রীরা প্রায় সকলেই বাংলা শব্দের পুরাতন বানান ও আধুনিক বানানের যুগ। প্রায় ত্রিশ হাজার শব্দ সম্বলিত নববিধান এই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সংকলন। অভিধানটির কলেবর ছোট হলেও যাবতীয় প্রয়োজনীয় শব্দ এবং প্রকৃত অর্থ ও যোগ্য প্রতিশব্দের উল্লেখ আছে এতে।

এছাড়া বাংলা বানানের নিয়ম, সরকারী কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা, বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়, চরিতাবলী, প্রবচন সংগ্রহ, নয়া ওজন প্রণালী, প্রুফ সংশোধন প্রণালী ইত্যাদি বহু বিষয়ের উল্লেখ এতে আছে। দাম—দশ টাকা

'নূতন বাঙ্গলা অভিধান'

প্রায় অর্ধলক্ষ শব্দ সম্বলিত এই অভিধানটি বাংলা ভাষার জগতে একটি অতুলনীয় সংকলন। এতে আছে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, অপভ্রংশ, বিদেশাগত ও বহু প্রাদেশিক শব্দ; এই অভিধানের সর্বাধিক আকর্ষণ আধুনিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনকথা, দেশীয় ও বিদেশীয় খ্যাতনামা পুস্তক সমূহের পরিচয়, প্রবচন, বাংলা বানানের নিয়ম, সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা, বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও প্রুফ দেখার নিয়ম ইত্যাদি। দাম—পঞ্চাশ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ বামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

অন্য আর এক তীরে ॥ আলেকজেণ্ডার পলেভিচ ॥ অনুবাদ ॥ বিপুল রায়

[আলেকজেণ্ডার পলেভিচ রাশিয়ার এক নামী লেখক। মূল রচনা "Shore of sorrow—Shore of love]"

প্রতিবারই কোথাও না কোথাও যাই আমি। সেবার গিয়েছিলুম উত্তরের এক সমুদ্রে। সাথে এক আঁকিয়ে বন্ধু। বন্ধুটির বয়েস অল্প। কিন্তু আঁকাজোকায় হাত বেশ পাকা। বার কয়েক সমুদ্র ঘুরে একখানা বই লিখেছেন এক ভদ্রলোক। লোভনীয় বই, জলে জলে বেড়িয়ে বেড়ানোর নানান খবরে ঠাসা। বইটির অলংকরন করতে হবে। সেই দায়িত্ব নিয়েই এসেছে ও। বই ভালো, তাই ভালো কিছু ছবি চাই, এমন ছবি যাতে লেখার মেজাজ ঠিক ঠিক ফোটে। বন্ধুটি প্রায়ই তাই থাকে না। রং-তুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে। আমি তীরে বসে থাকি। বসে বসে আকাশ দেখি। নীল সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ ভাঙ্গে, ফেনা চলকায়, দেখি। রোদলোভী মানুষের দল কলকল করে, শুনি। আর সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যে বইটই পড়ি। একদিন ঠিক করলুম, হেমিংওয়ের "দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি সী" পড়ব। যতটা পারি, তীড়-ভাট্টা এড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে নিরিবিলি দেখে একটা জায়গা খুঁজে বার করলুম। আয়েস করে বসে, সবে খুলেছি বইটা, ঘস্ করে ভারী একটা শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি—একটা নৌকো, তীর ঘসটে বালুর উপর উঠে এসেছে। ভেতরের খোল থেকে ঝপাং করে একটু বাদেই লাফিয়ে পড়ল এক বুড়ো। ভরাট মুখ। নীল চোখ। এক মাথা জপোলী চুল। গালে দাড়ির জঙ্গল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলুম আমি। মানুষের সাথে মানুষের এমন মিল হয় কখনো? নিজের চোখকেও যে বিশ্বাস হয় না! আশ্চর্য্য! একেবারে অবিকল হেমিংওয়ে!

আমার অবাক ভাব তখনো কাটেনি। ধারালো বুদ্ধি মেলে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, "কি হে, ব্যাপার কি তোমার? অমন হাঁ করে কি দেখছে বলতো?"

"হেমিংওয়ে বলে ভুল করেছিলুম আপনাকে।" আকাশোদের গলায় বললুম। "সত্যি, কি অবাক কাণ্ড বলুন তো! আরেকবারও ঠিক এমনটিই হয়েছিল আমার জানেন? সার্ডোলতত্তে সেবার একজনকে দিও টলস্টয় ভেবে বসেছিলুম। মানুষে মানুষে কি অদ্ভুত মিলই না চোখে পড়ে যায় কখনো কখনো? আপনাকে দেখেই যেমন মনে হল—আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে।"

"ও নাম তো এর আগে শুনিনি কখনো?"

"এই তো, এখানেই, আমার কাছেই তিনি আছেন।" 'ফরেন লিটারেচারের' পাতা থেকে কেটে রাখা একটা ছবি মেলে ধরলুম তার চোখের সামনে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুড়ো দেখল ছবিটা।

"ঠিক জেলের মত দেখতে না?"

"ঠিক বলেছেন আপনি।"

"তবে তো সে আমাদেরই লোক। আমাদেরই একজন।" খুশিতে চকচক করে উঠল বুড়োর নীল চোখ জোড়া। বিকিয়ে উঠল মুখের রেখাগুলো। "বইটাতে তার কথাই লিখেছে বুঝি?"

"না। বইটা তিনি নিজেই লিখেছেন।"

"খুব বড় বই না? পড়তে অনেক সময় লাগবে বুঝি?" মাথাভরা চুল ঝাঁকিয়ে জানতে চায় বুড়ো।

"উনি কিন্তু এই একটি বইই লেখেন নি। তাঁর লেখা আরো অনেক বই আছে। রোজই তিনি কিছুটা করে লিখতেন। গত বিশ বছর ধরে তিনি সমানে লিখেছেন।"

"মানুষটা তবে খুব খাটিয়ে ছিল বল?" বুড়ো খুশী হয়ে ওঠে। জোড়ালো তারিফ করে।

"কতদিন তিনি ছিলেন পৃথিবীতে?"

"জন্মেছিলেন—১৮৯৯ সালে। ১৯৬১-র গরমে নিজের বন্দুকের গুলিতেই আত্মহত্যা করেন। শরীর মন কোনটাই তার খুব ভালো যাচ্ছিল না তখন। তিনি আমেরিকার মানুষ ছিলেন।"

"আরে!" বুড়ো আশ্চর্য হয়। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, "তবে তো সে আমার বয়েসই ছিল দেখছি। কিন্তু দেখছো তো, কেমন দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি আমি এখনো। দেখো, রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, মনের অসুখ—এসব মানুষের জীবনে থাকেই। কিন্তু তারা যেন মানুষকে কাবু না করে ফেলে, মানুষকেই তো দেখতে হবে তা। লড়তে হবে তার বিরুদ্ধে। হার মানলে তো চলবে না। কক্ষনো না। হার মেনেছো কি দেখবে—তাজা তাজা ইচ্ছেগুলো সব মরে যাবে, জীবনটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে একদিন। আর সারা দুনিয়া জুড়ে জলজ্যান্ত মানুষগুলো তখন নিজের বন্দুকের গুলি খেয়েই নিজেরা মরতে থাকবে এক এক করে। এ কাজ কি মানুষের সাজে কক্ষনো?....আমাকে একটু পড়ে শোনাবে বইটা? কি লিখেছে শুনতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে আমার। তাড়াহুড়ো কিছু নেই আমার এখন।.....চল, নৌকোয় উঠে পড়। খুব ভালো লাগবে তোমার, দেখো।"

বই থেকে বেশ কিছুটা পড়ে শোনালুম বুড়োকে। দেখতে দেখতে অনেকটা সময়ও কেটে গেল। মাথার উপর খোলা নীল আকাশ। আকাশে মেঘ আর রোদের নীরব লুকোচুরি। নীল জলে ছোট ছোট ঢেউ। নৌকোর গায়ে তাদের নরম শব্দ। মনে হচ্ছিল, ঢেউগুলো যেন প্রকৃতির সাথে মানুষের লড়াইয়ের খুঁটিনাটি সব কথা মন দিয়ে শুনছে। পড়তে পড়তে গলা শুকিয়ে এল এক সময়। কথাও জড়িয়ে আসছিল। বুড়োএক বোতল জল আমার দিকে এগিয়ে দিল। ঢোক দুয়েক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলুম।

"আজ এটুকুই থাক। বাকীটা কাল শোনাবো।" বুড়োকে কথা দিয়ে বই বন্ধ করে দিলুম। বুড়ো কোনো উত্তর দিল না। তারী অবাক লাগল আমার। তাকিয়ে দেখি—বুড়োর চোখে চিকচিক করছে জল।

"কাল আবার এসো। ভুলো না কিন্তু। মনে থাকে যেন, কথা দিয়েছ আমাকে।" একটু হেসে বুড়ো বলে, "তারি সুন্দর পড় তুমি।"

"জানেন, একসময় আমি স্বপ্ন দেখতুম—অভিনেতা হব।" বুড়োর দিকে মুখ তুলে বললুম।

"আমিও স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম—ক্যাপ্টেন হব।" বুড়ো কথার পিছনে আরো কথা জুড়ে দেয়। "নাবিক হয়ে জাহাজে কাজ করেছি। জলে জলে ঘুরেছি। কিন্তু ক্যাপ্টেন আর হতে পারলাম না কোনদিন। কি করে হব বল? তার জন্যে যা লেখাপড়া করা দরকার, তা তো আর করিনি আমি। তাই দুঃখের স্বাদ ঘোলেই মেটালাম। মাছধরার কাজটাই শেষমেষ বেছে নিলাম একদিন।

এই সমুদ্রই আজ আমাকে টেনে নিয়ে এসেছে এখানে, জানো ?···মেয়েগুলোও দলে দলে ভীড় জমাতো এই তীরে—আমিও ঘুরে ফিরে এখানেই ছুটে আসি।" আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বুড়ো মুচকি হাসলো।

"আচ্ছা, বলতে পারেন আমাকে, এ জায়গাটাকে সবাই 'দুঃখের তীর' বলে কেন ?"

"পারি।" একটু থেমে আবার শুরু করে বুড়ো, "যারে কাছে এমন একটাও বাড়ী তুমি খুঁজে পাবে না যে বাড়ীর কেউ না কেউ এখানে এসে ঐ বাঁকুলে সমুদ্রটার পেটে যায়নি।" বলতে বলতে বুড়োর গলা ভারী হয়ে ওঠে।

"মেয়েগুলো এখানে এসে চুপ করে বসে থাকে। মুখগুলো যে কি করুণ হয়ে থাকে ওদের দেখলে বুকটা আমার ফেটে যায়, জানো ? যারা হারিয়ে যায়, কোনোদিন তো আর ফেরে না তারা। তবু পথ-চাওয়া কান্না নিয়ে ওদের পথ চেয়ে থাকে হতভাগীগুলো।···এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি থাকতে পারে পৃথিবীতে, বলতে পারো আমাকে ?"

"কিন্তু সে তো পুরনো আমলের কথা। একটা সময় ছিল, যখন ও রকম ঘটত। আপনি যা বলছেন, সে তো অ-নে-ক আগের, বলতে পারেন, সেই সুদূর অতীতের কথা। দিনকাল এখন কত বদলেছে। এখন কত উন্নত হয়েছি আমরা। মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন কত যন্ত্রপাতি বার করেছি। কই, সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেরা তো আগেকার মত আর নিখোঁজ হয় না আজকাল।···দেখুন, দু-একটা ঘটনা অবশ্য কখনো-সখনো যে ঘটে না, এমন নয়, সেটাকে ব্যতিক্রম বলাই ভালো। আমার তো তাই-ই মনে হয়।···তাহলে বলুন তো, এখনো কেন সবাই 'দুঃখের তীর' বলবে একে ?"

"মতোকে এখনো তবে লোকে মন্দো বলে কেন ?" সাথে সাথেই বুড়ো পালটা প্রশ্ন করে।

"'দুঃখের তীর' নামটা আজও জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে। কেন জানেন ?···তেমন একটা মানুষ নেই যে নামটা পাল্টে দিতে পারে, তাই আছে।···আসুন না, কাজটা আমরা দুজনেই শুরু করি—আমি আর আপনি।"

"কি বলছ তুমি ? কেমন করে এ কাজ করবো আমরা ?"

"কেন ? প্রত্যেককে বলবো, বোঝাবো—এ তীর ভালোবাসার, দুঃখের নয়।"

"কিন্তু কি করে তা বলবো আমরা ? চেঁচিয়ে ফাটিয়ে তো আর সমুদ্রকে চুপ করাতে পারবে না তুমি। আর ও নামটাও ঘুচবে না তাতে !"

"এখানে যারা আসে, যারা আসবে, জনে জনে তাদের বলবো। গ্রামের ভেতরে গিয়ে প্রত্যেককে বোঝাব। তারপর একটা গল্প লিখবো—"দুঃখের তীর—ভালোবাসার তীর"। আমরা আমাদের মত করেই বলবো। দেখে নেবেন, কি হয় তখন !"

"ভালো কথা।" বুড়ো মাথা ঝাঁকায়। প্রস্তাবে ও খুশী। "তীরের ওদিক থেকে শুরু করবো আমি। তুমি শুরু করবে এদিক থেকে !"

সাদা সাদা বালু ছড়ানো আঁকা বাঁকা লম্বা তীর। এখানে ওখানে রঙ বেরঙের চাদর পাতা। চাদরে পা এলিয়ে শুয়ে আছে রোদ-লোভী নানা বয়সের অসংখ্য মানুষ। বুড়ো ওদের ছাড়িয়ে চলে গেল ঐ কোনে। আমি রইলুম এ দিকটায়। যেমন কথা, তেমনি কাজ। রঙীন ছাতার আড়ালে বসে বসে রোদপোড়া একটি মেয়ে বোতল থেকে পানীয় ঢেলে খাচ্ছিল। আমি তার সামনে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসলুম, "এ জায়গাটার নাম কি জানেন ?"

"ভীড় করবেন না। বিয়ে-থা আমি অনেক আগেই করে ফেলেছি, মানে মানে সরে পড়ুন এখান থেকে।" ঝাঁঝালো গলার সাফ জানিয়ে দিল মেয়েটি।

"'ভালোবাসার তীর' এটা, বুঝলেন?" গলা নরম করে বললুম।

"হাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম।" আমার দিকে না তাকিয়েই উপেক্ষার ভঙ্গীতে জবাব দিল মেয়েটি।

"সবাইকে বলবেন—ভালোবাসার তীরে আপনি একদিন এসেছিলেন।" অনুরোধ করলুম মেয়েটিকে।

"ভালো চান তো কেটে পড়ুন চটপট। আমার স্বামী এসে পড়লে কিন্তু মারধোর খাবেন, সে কথা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।"

অমন চটাং পটাং করে কেউ কথা বলে? ধনী মেয়েরে বাবা! খুব রাগ হলো মেয়েটির উপর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম সামনের দিকে। একজোড়া তরুণ-তরুণী বালু নিয়ে লোফালুফি করছিল। আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, "আজ থেকে এ তীরের নাম হবে 'ভালোবাসার তীর' জানো তো তোমরা"?

"বলুন তো কি নাম এ জায়গাটার?" আরেক বুড়োকে প্রশ্ন করলুম আর আরেক জায়গায় গিয়ে।

"নামধাম অত জানিনে বাবু। আমি এখানে নতুন এসেছি।" বুড়ো জবাব দেয়।

"ভালো লাগছে এ তীরটা আপনার?"

"সব তীরই ভালো লাগে আমার। আমি নাবিক।"

"বেশ, তবে জেনে রাখুন, হাত-পা ছড়িয়ে যেখানে বসে বিশ্রি আরামে আপনি জিরোচ্ছেন, তার নাম 'ভালোবাসার তীর'।"

"ওঃ! খুব সুন্দর নাম তো! ঠিক মনে থাকবে আমার।"

এবার গিয়ে দাঁড়ালুম আরেকটি মেয়ের সামনে। সুন্দরী। আর সব স্নানলোভী যাত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে বেশ কিছুটা দূরে একা বসে আছে মেয়েটি। অমন রূপ অথচ মুখখানা ম্লান, বিষন্ন। হাত দুখানা অলস ভঙ্গীতে হাঁটুতে জড়ানো। উদাস চোখজোড়া দূর-সমুদ্রের দিকে ছড়ানো। কৌতূহল হল।

"একটু বিরক্ত করছি আপনাকে। কিছু মনে করবেন না।" খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম মেয়েটির। ধূসর চোখজোড়া বড় করে মেয়েটি আমার দিকে তাকাল।

"এ জায়গাটার নাম 'ভালোবাসার তীর' জানেন তো?" আমি বললুম।

"আপনি বোধহয় ভুল করলেন একটু।" ম্লান ঠোঁটে হাসলো মেয়েটি। "এটা দুঃখের তীর। এর ধারে কাছেই আমি বড় হয়ে উঠেছি। এ জায়গাটাকে আমি অন্তত আপনার চেয়ে ভালো করেই চিনি। এখানেই আমার বাবা গুলি খেয়ে মরেছিল একদিন.....।" বলতে বলতে যন্ত্রনায় ককিয়ে ওঠে মেয়েটি।

"কিন্তু জেনে রাখুন, আর কোন মানুষকে এখানে গুলি খেয়ে মরতে হবে না। কোনদিনই না। এখন থেকে ভালোবাসা নিয়েই মানুষ এখানে আসবে, মানুষকে ভালোবাসবে, ভালোবাসবে এই নীল সমুদ্রকে, রোদ ছড়ানো দূরের ঐ জলন্ত সূর্যকে।.....আর দেখুন, যন্ত্রনার দুঃখের ঢেউ পার হয়ে, একদিন তো ভালোবাসার তীরে এসেই আমরা উঠি, সুন্দর করে বাঁচি।"

"কেন? যুদ্ধ আর বাধবে না?"

"না, যুদ্ধ যদি বাধেও কোনদিন, জানবেন—এখানে বাধবে না।"

"কি করে জানলেন?"

"আমার মনে হয়। বুকের মধ্যে আমি সে কথাই যে শুনতে পাই।"

"বেশ, এ তীর তবে ভালবাসারই হোক।.....একজনকে আমার খুব ভালো লাগতো, জানেন। খুব ভালবাসতাম তাকে। এখানেই তাকে আমি হারিয়েছি।" অসহায় করুণ চোখে মেয়েটি তাকালো।

"সে ঠিক ফিরে আসবে একদিন, দেখবেন।" আশ্বাস দিলুম মেয়েটিকে।

"গতবারই ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি সাঁতার কাটছিলাম। এখানে—এই বালুর ওপরই শুয়ে ছিল ও টেরই পাইনি আমি—ও নেই। কিন্তু আমি তখনো সমানে ওকে ডেকে চলেছি, জলে নামতে, আমার সাথে সাঁতার কাটতে। হঠাৎ কি যে হল ওর।...একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে কাজ করত ও।...দেখুন তো, আমি নিজের কথাই বলে চলেছি এতক্ষন। আপনিও পদার্থবিদ বুঝি?" মুখে নকল হাসি টেনে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল মেয়েটি।

"না, সার্জেন।"

আলাপ জমানোর জন্য উসখুস করে উঠল মেয়েটি। বলল, "আমিও সার্জেন। কতদিন হল সার্জেন হয়েছেন আপনি?"

"পাঁচ বছর।"

"তাই বুঝি।" হাসলো মেয়েটি। "আমি ভাবলাম, ডাক্তারির ছাত্রই আছেন এখনো। এখন দেখছি আপনি আমার বয়েসই হবেন। তা কত বয়স আপনার?"

"এ মাসের ছাব্বিশে, সাতাশে পা দেব।"

"তবে আমি আপনার ছোটই হবো। কিন্তু সার্জেন হয়েছি আপনার অনেক আগেই। ডাকযোগে লেখা-পড়া করেছি তো, তাই হয়ত হবে।"

"যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি। আমি এখন যাচ্ছি। একটু বাদেই ফিরে আসব আবার। তীরের নতুন নামটা এখুনই সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে তো।"

"আমি কিন্তু আপনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো।" মেয়েটি আমার দিকে তাকাল। হাসি হাসি শান্ত টানা টানা চোখ। চোখের তারায় থমকে যাওয়া একরাশ কথা।

একটু বাদেই সেই বুড়োর সাথে দেখা। "কি, কাজ কতদূর এগোলো ও দিকে বলুন?"

"এগোচ্ছে তো ভালোই।" বুড়ো জানায়। একটু ইতস্তত: করে তারপর বলে, "তবে কাজটা প্রথমে যত সোজা ভেবেছিলে তুমি, ঠিক ততটা সোজা নয়, বুঝলে? বেশীর ভাগ মানুষ দেখছি পুরনো নামটাই জানে"।

"কাল, পরশু, তার পরের দিন—রোজ যদি একবার করে নতুন নামটা ওদের মনে করিয়ে দিই, তবে মনে হয়, পুরনো নামটা ওরা সবাই ভুলে যাবে, কি বলুন?"

"কিছু বোর্ড আর একটা পেন্সিল জোগাড় করে সব জায়গায় লিখে লিখে দেবো—'ভালোবাসার তীর'। এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্টের কানেও তুলে দেখব কথাটা। হয়ত ওরা আমাকে আর জলে জলে ঘুরতে দেবে না। ওরা ভাবে, শরীরে আমার জোড়টোড় কিছুই নেই। তাই হয়ত' আর কোন কাজই করতে দেবে না আমাকে। কথাটা অবশ্য একদিক থেকে মিথ্যে নয়—বাতের সেই পুরনো ব্যথাটা তো থেকে থেকেই আজও চাগিয়ে ওঠে। উ: কোত্থেকে যে সেবার এই অলক্ষুনে বাত এসে ধরল আমাকে! আর বুড়োটাও হয়েছে তেমনি! দিনরাত কানের কাছে প্যানর প্যানর করবে—'পেনসন পাচ্ছো, চুপ করে বসে থাকো বাড়ীতে। অল্পবয়সী ছোকরাদের কাজ তুমি করতে যাও কেন? ছোকরারাই করুক। ওসব কাজ ওরাই ভালো পারে।' কপালটাই আমার খারাপ। ম্যানেজমেন্টও বুড়ী মেয়েছেলেটার কথাই শুনল শেষ অবধি।...আমি কিন্তু বুড়োর চোখে ধুলো দিয়ে ঠিক চলে এসেছি, দেখছো তো? ফিরবও দেরী

করে। আমাকে যদি ওরা সমুদ্রে আর না পাঠায়, না পাঠক। তারী বয়েই গেল! আমি আমার ডিঙি নৌকো করে ঠিক বেরিয়ে পড়ব একদিন। তোমার ঐ বইয়ের বুড়োটা যেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনি করে····।"

"ও বুড়ো কিন্তু পেনসন পায়নি।···তবু ও গিয়েছিল। বলতে পারেন, না গিয়ে কোন উপায় ছিল না ওর?"

"তা হবে।" বিরক্তি ফোটে বুড়োর চোখেমুখে। "কিন্তু সমুদ্র যে ঠিক কি, ভালো করে তুমি জানো না হে ছোকরা। সমুদ্র হ'ল নিজের বাড়ীর মত, সোহাগী মেয়েমানুষের মত, বুঝলে? দূর থেকে কেবলই টানে, কেবলই হাতছানি দিয়ে ডাকে।···আমি নৌকো করে বেরিয়ে পড়ব। পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে ঘুরব। কেউ দেখতে পাবে না আমাকে।...রাত্তিরে আজ চাঁদ উঠবে। আকাশটাও পরিষ্কার থাকবে। আজ আমি বেরোবই। তবে বইয়ের ঐ বুড়োটা যতদূর গিয়েছিল ততদূর হয়ত যাব না। ও বুড়ো তো বড় মাছের লোভে লোভেই অতদূর গিয়েছিল। মাছ আমিও ধরি।" বুড়োর চোখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়। "...তবে ছোট ছোট এই যা।" দপ্ করে সব আলো নিভে গিয়ে মুখখানা কালো হয়ে যায় বুড়োর। ওর চাউনি লক্ষ্য করে দূরে তাকিয়ে দেখি গাট্টাগোট্টা লম্বাপানা এক মহিলা গ্রামের ওধার থেকে হনহন করে এগিয়ে আসছে বালুর ওপর দিয়ে।

"সেরেছে রে, হয়েছে আমার মাছ ধরা। এবার যে আমাকেই বঁড়শিতে গেঁথে ফেলবে ও।" বিড়বিড় করে উঠল বুড়ো।

"ভালোবাসেন না আপনি ওকে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বাসি। বাসি বইকি। নিশ্চয়ই বাসি। এখনো বাসছি—গত চল্লিশ বছর ধরেই বেসে আসছি," বলেই বুড়ো নৌকোর দিকে পা বাড়ায়।

"কি—লিপ!"

যেন বাজ পড়ল কোথাও। হকচকিয়ে বুড়ো থেমে গেল। একটু বাদে খুঁড়িয়ে-চলা ঘোড়ার মত এ পায়ের ভর ও পায়ে চালান করে দিয়ে হাঁটতে লাগলো একটু একটু করে। মহিলাটি এর মধ্যে বুড়োর কাছাকাছি এসে হাজির।

"কি করছিলে এখানে শুনি?"

"বই পড়ছিলাম একটা, মানে, ঐ ছোকরাটি পড়ে শোনাচ্ছিল আর কি।" বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল আমার দিকে।

"বাড়ী চল শীগগির। কের একটা রোগ না বাধালে আর জব্দ করতে পারছো না আমাকে, না? বলি মতলবটা কি তোমার শুনি?"

"কিন্তু আমরা তো একটা বই পড়ছিলাম শুধু।"

"বই?...কোথায় বই?"

"নৌকোয়।"

"নৌকোয়?" বোমার মত ফেটে পড়লেন মহিলা।

"হ্যাঁ, নৌকোয়।" কাঁপতে কাঁপতে জবাব দেয় বুড়ো।

"চুপ করে বস ওখানে। ভেবেছো, যোকা বানাবে আমাকে না? কিন্তু জেনে রাখো, সে আর হতে দিচ্ছি না আমি। সে গুড়ে বালি। বুঝলে?"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিই নিয়ে আসছি বইটা!" নৌকোর দিকে আমি ছুটে গেলুম। কিন্তু

এসে দেখি—সব ফাঁকা। কেউ নেই। এদিক ওদিক তাকালুম। হঠাৎ চোখদোটা আমার থমকে দাঁড়ালো: স্কুল যাওয়া ছেলের মত হাত ধরে বুড়োকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন মহিলা।

এক ফাঁকে মাথা ঘুরিয়ে হঠাৎ এক ঝলক চোরা চাউনি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে বুড়ো, "যা বলেছি, তা করবই। কাল আমি আবার আসবো।"

স্থির চোখে আমি তাকিয়ে রইলুম। বালুর ওপর পা ফেলে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ভারি ভালো লাগছিল দেখতে আমার। মনের কি টান বুড়ো বুড়ীর! আজও কি গভীর ভালোবাসা দুজনের! আনন্দে ভরে উঠছিল মনটা।

তীর ধরে তখনো ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। আমি দেখছিলুম। চোখ থেকে অনেক দূরে ওরা হারিয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। কতক্ষণ যে সেদিন ওভাবে দাঁড়িয়েছিলুম ওখানে, আজ আর সে কথা মনে নেই আমার।

With the compliments of

A. C. SIRCAR & SONS

114, Elliot Road

Calcutta—7000 16

পবনদূতম্ ॥ কবিরাজ শ্রী ধোয়ী ॥ অনুবাদ ॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ

[কবি ধোয়ী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে এটুকু জানা গেছে, তিনি গৌড় অধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। কবি ধোয়ীর 'পবনদূতম' একসময় উত্তর ভারতে অনেক খ্যাতি লাভ করেছিল। পবনকে দূত করে বাংলাদেশের রাজার প্রতি দক্ষিণ দেশের রাজকন্যার প্রেম নিবেদন—সে যুগে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের সংহতির চিত্র তুলে ধরেছে। এই কাব্যটির মূল ছন্দকে রক্ষা করার জন্য মন্দাক্রান্তা ছন্দে অনুবাদ করা হয়েছে।]

অস্তি শ্রীমত্যখিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্বাণাং কনকনগরী নাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈমৈর্হর্ম্যৈর্ভুবনবিজয়ারম্ভবদ্ব্যালিখদ্ভি—
র্যস্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্তু। ১॥

বিশাল বিশ্বের মহান সুন্দর মলয়চন্দন পর্বত
সেখানে গন্ধর্বদের পুরী—নাম কনকনগরী কী মনোরম!
প্রাসাদ-ভবনের হৈমচূড়াগুলি আকাশ করে যেন চুম্বন
দেখলে মনে হয় যেন বা সুরধাম অমরাবতীর শাখানগরী। ১॥

তস্মিন্নেকা কুবেলয়বতী নাম গন্ধর্বকন্যা
মন্যে ধৈর্যং মৃদুকুসুমতোঽপ্যাদৃতং বা স্মরস্য।
দৃষ্টা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং ক্ষৌণীপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সংবিধেয়ীবভূব ॥ ২ ॥

সেখানে এক গন্ধর্ব-কন্যকা নামটি কুবলয়বতী তার
কামের ফুলধনু ! তীব্র তারও চেয়ে বাসনা জাগাতে যে সক্ষম।
একদা সেই মেয়ে—বিশ্বজয়ী রাজা দেখল লক্ষ্মণদেবকে
এবং ফুলশর কামের কাছে আহা তখনি হল সে যে অর্পিতা ॥ ২ ॥

বালোদ্যানীবৃদি মনসিজং সানতিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুশ্যামা কতিচিদনয়ং কাতরা বাসয়ামি।
সদ্যঃ দেশান্তরমথ মধাবন্যথৈব প্রয়ন্তং
গাঢ়োৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥ ৩ ॥

বাল্যসখীদের তবুও বলেনি সে গোপন কথা তার কামনার
ক্রমশঃ দিনদিন পাণ্ডু তনুশ্রীও সহ্য করে শর-বর্ষণ।
নামলে মধুমাস মলয় ফিরে এলে, দেশ-দেশান্তরে ভ্রাম্যমান,
প্রণয়-বিহ্বল প্রণাম করে তাঁকে করল সবিনয়ে নিবেদন ॥ ৩ ॥

ত্বত্তঃ প্রাণাঃ সকলজগতাং দক্ষিণত্বং প্রভূত্যা
জন্মালং ত্বাং পবন ! মনসোঽনন্তরং ব্যাহরন্তি।
তস্মাদেব ত্বয়ি খলু ময়া সং প্রিয়ীভোঽ র্থিভাবঃ
প্রায়ো ভিক্ষা ভবতি বিফলা নৈব যুষ্মদ্বিধেষু ॥ ৪ ॥

সকল জগতের তুমি যে প্রাণরূপী স্বভাবে সহৃদয়-চিত্ত,
মনের মত প্রায় তুমি যে বেগবান তোমার পথ-রেখা বিস্তর।
তোমার কাছে তাই প্রার্থী হয়ে আজ এসেছি, বিনীত এ প্রার্থনা।
তোমার মত মহাজনের কাছে, জানি, বিফল মনোরথ হয় না কেউ ॥ ৪ ॥

বীক্ষ্যাবস্থাং বিরহবিধুরাং রামচন্দ্রস্য হেতোঃ
মারুতিঃ সাগরং লঙ্ঘন একদা করলেন স্বেচ্ছায়,
তুমি যে তাঁরই পিতা, অব্যাহত-গতি, দৌত্য কর তুমি প্রেমে আমার,
গৌড়দেশে চলো ! মলয়পুর থেকে বলো না গৌড় আর কতটা দূর ? ৫ ॥

তত্রাবশ্যং কুসুমসময়ে স ত্বয়া শীলনীয়ঃ
সাস্রোদ্যানস্থগিতগগনপ্রাঙ্গণো গৌড়দেশঃ।
তস্যোপান্তে বসতি কথয় নৃপতের্জীবনপ্রাণহেতোঃ
প্রাচুর্ভাবস্ত্রিগতি খলু ত্বাদৃশানাং পরার্থঃ ॥ ৬ ॥

গৌড়ে গেলে তুমি দেখতে পাবে ঠিক এখন কুসুমিত বসন্তে
বনে ও উদ্যানে সঘন শ্যামলিমা আবৃত করে আছে গগনতল।
আমার কথা তুমি রাজাকে বলো, প্রিয়, যাঁচাতে আমার এই জীবন-প্রাণ।
বুঝি এ ত্রিভুবনে তোমার মত মহাজনেরা জন্মান পরার্থে ॥ ৬ ॥

ক্রতানর্ঘ্যং পরিমল নিতম্বদ্বানোকহানাং
ত্বূর্ণং তাবদ্ বিদধ মলয়োপত্যকাকাননানি।
যাবন্নৈতে নিধুবন কলাকেলিতাজোত্তুজস্থাঃ
ভোগব্যাজাচ্চুলুকচুলুকং মৎসখাস্তাং পিবন্তি ॥ ৭ ॥

চন্দন বৃক্ষের স্নিগ্ধ পরিমল যত্নে করো তুমি সংগ্রহ
এবং দ্রুতগতি এগিয়ে যেও ছেড়ে মলয় বনভূমি উপত্যকা।
না হলে নিধুবনে মত্তকেলিরত সর্পদল যত মৎসরী
ভোগের ছলে তারা চুমুকে চুমুকে যে তোমায় শুষে নেবে নিঃশেষে ॥ ৭ ॥

শ্রীখণ্ডাদ্রেঃ পরিসরমতিক্রম্য গব্যূতিমাত্রং
গন্তব্যান্তে কিমপি জগতীমণ্ডনং পাণ্ড্যদেশঃ।
তত্র খ্যাতং পুরমুরগপতিখ্যাত্য তাম্রপর্ণ্যা
তীরে মুক্তক্রমুক তরুতির্বিবরেখে তরেথাঃ ॥ ৮ ॥

গিরি শ্রীখণ্ডের পরিধি পিছে ফেলে পেরিয়ে গেলে আরো ক্রোশ
দেখতে পাবে সখা, জগৎ বিখ্যাত মুগ্ধ মনোহর পাণ্ড্যদেশ।
সেখানে নদী তীরে তাম্রপর্ণীর দীর্ঘ-ছায়াবন সুপারী বন
তারই মাঝে দেখো নগরী শোভে এক উরগপুর নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৮ ॥

সম্ভোগান্তে শ্রমভুজলতা নিঃসহানাং বধূনাং
ব্যাধুন্বন্তোঽনুচিতকবরী ভার মব্যাজমুগ্ধম্।
অস্মিন সদ্যঃ প্রজলদগুরুঃ সৌধজালৈরুপেতা
প্রত্যাসন্না মলয় মরুতস্তালিবৃন্তী ভবন্তি ॥ ৯ ॥

সুরত ক্লান্তিতে সেখানে বধূদের শিথিল বাহুলতা শক্তিহীন
প্রস্তুকেশভার পারে না বেঁধে নিতে ; তবু সে কুন্তল চমৎকার।
তাদের তনুতটে শ্রান্তি-স্বেদকণা যত্নে মুছে দিতে মলয়বায়ু
সৌধ-বাতায়নে প্রবেশ করে হয়ো মধুর যেন তাল-ব্যজনী। ৯ ॥

ক্রীড়াশৈলং কুজগনগরী যোষিতাং কৌতুকেন
সেতুং বায়োর্জলধিকরিণঃ শৃঙ্খলাদামদীর্ঘম্।
ভাতি স্নেহাদবনিতনয়া জীবনাধার হেতো—
লঙ্কাদ্বীপং প্রহিত ইব যো বাহুরেকঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ১০ ॥

কুসুমপুর-নারী, তাদের প্রিয় ক্রীড়াশৈলে যদি থাকে কৌতূহল,
সেতুর দিকে যেও, দীর্ঘ শৃঙ্খল যেন বা পয়োনিধি-মাতঙ্গের।
দেখলে মনে হয় অবনী-তনয়াকে দিতে কি সান্ত্বনা সস্নেহে
লঙ্কাদ্বীপে আজ একটি বাঁচ তার করেছে প্রসারিত ধরিত্রী? ১০ ॥

কুর্যাদ্‌গৌরীকরকিসলয়াকৃষ্টচূড়ানুষাংশো
র্যত্রাহুতৈঃ কুসুমকলুষং তত্র রামেশ্বরস্য।
যত্র ত্রিবলিবিষমং বারসীমন্তিনীনাং
হস্তোৎকম্পং কথয়তি বিধেঃ পট্ট কাঞ্চী পদস্য ॥ ১১ ॥

রামেশ্বরে গিয়ে দেখতে পাবে তার উচ্চ চূড়া পূত হবিষ্যে
ক্রতা গৌরীকে, চন্দ্রচূড়-জটা-কৃষ্ট কিসলয়-করে তাঁর।
সেখানে স্ফীতকটি বারাঙ্গনাদের ত্রিবলী বন্ধুর তুলনাহীন।
দেখলে মনে হবে বিধির হাত বুঝি কেঁপেছে গড়তে এ রেখাত্রয়! ১১ ॥

লীলাসারৈরমরনগরস্পর্ধি গর্ধবং হরন্তীং
পদ্ভ্যাং কাঞ্চীপুরমথ দিশো ভূষণং দক্ষিণস্যাঃ।
যত্তং যত্র প্রহরিক ইবোজ্জাগরং নাগরাণাং
কূর্বন পাণি-প্রণিহিতধনুর্ঘায়তে পঞ্চবাণঃ ॥ ১২ ॥

দাক্ষিণাত্যের ভূষণ, দিকশোভা কাঞ্চীপুরে গিয়ে দেখবে
বস্তুত—পুরখানি হরণ করে যেন অমর নগরীর গৌরব।
কুসুম ধনু তাঁর পঞ্চবাণ হেনে সেখানে পুরবাসী নাগরদের
সারাটা রাত ধরে জাগিয়ে রেখেছেন যেন বা রাত্রির প্রহরী! ১২ ॥

এমিলিকে একটি গোলাপ ॥ উইলিয়াম ফকনার ॥ অনুবাদ ॥ তপন চট্টোপাধ্যায়

[উইলিয়ম ফকনার আমেরিকান লেখক। জন্ম ১৮৯৭ সালে, নিউ আলবানিতে। জীবনের বেশির ভাগ সময় অক্সফোর্ডে কাটিয়েছেন, যেখানে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ফকনারের প্রথম প্রকাশিত রচনা একটি কবিতা, 'দি নিউ রিপাবলিক' পত্রিকায় ১৯১৯ সালে। ১৯২৪ সালে প্রথম গ্রন্থ 'দি মাস্‌বেল ফন'—একটি কাব্যগ্রন্থ—প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে 'দি সোল্‌জার্স্‌ পে' নামক উপন্যাস প্রকাশের সংগে সংগে যশ ছড়াতে আরম্ভ করে। মহত্বের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৫০ সালে তিনি নবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান গল্পটি 'এ রোজফর্‌ এমিলি' বা 'এমিলিকে একটি গোলাপ', ১৯৩০ সালে 'দি ফোরাম' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। এটি লেখকের তথা ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত গল্প এবং ফকনারের বিশিষ্ট রচনাশৈলীর পরিচায়ক। লেখক হিসাবে ফকনার দুরূহ। পো, ডস্টয়েভস্কি এবং জয়েসের সমগোত্রীয়; হেমিংওয়ে বা স্টেনবেকের মতো সহজপাঠ্য নন। তাঁর রচনায় কৈশোরের আমেরিকা পুরোনো মূল্যবোধ নিয়ে বার বার এসেছে। বর্তমান গল্পটিতেও। তাছাড়া গল্পটির গঠন এবং সময়-বিন্যাস লক্ষণীয়।]

কুমারী এমিলি গ্রীয়ারসন যখন মারা গেলেন আমাদের গোটা শহরটা তার সমাধিস্থানে ভেঙে পড়লো। পুরুষেরা গেলো হটাৎ-ভেঙে-পড়া সৌধের প্রতি একধরণের শ্রদ্ধামিশ্রিত স্নেহানুভূতি নিয়ে। মেয়েরা বেশীর ভাগই গেলো কৌতূহলের তাগিদে, তার বাড়ির ভিতরটি দেখতে, যেখানে একটি বুড়ো নিগ্রো চাকর—একাধারে মালি ও পাচক ছাড়া বিগত দশ বছর অন্তত কেউ পদার্পণ করে নি।

বাড়িটি ছিলো বড়, চৌকো ধরণের,—সত্তর দশকের স্টাইলে,—গম্বুজ, চূড়া, ঘোরানো ব্যালকনি শোভিত। রঙ যে একসময় সাদা ছিলো বোঝা যায়। যে রাস্তার উপর অবস্থিত সেটি একসময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ছিলো। এখন অবশ্য সেখানে গাড়ী মেরামতের দোকান এবং তুলো পরিষ্কার করার যন্ত্র ছেয়ে ফেলেছে। এমন কি যে সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে রাস্তাগুলির নামকরণ করা হ'য়েছিল, তাদের নামগুলি পর্যন্ত বেমালুম মুছে গেছে এখন। কেবল কুমারী এমিলির বাড়ীটা এইসব তুলোর গাড়ি এবং পেট্রোল পাম্প সত্ত্বেও নিজের অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় নিয়ে বিদ্রূপের ভংগিতে পীড়াদায়কভাবে মাথা উঁচিয়ে আছে। এখন কুমারী এমিলিও চললেন সীডার কাঠের গন্ধসমৃদ্ধ কবরখানায় অতীতের দামী নামগুলির মালিকদের সংগে যোগ দিতে, যেখানে তারা কেল্টারমনের যুদ্ধে মৃত খ্যাত-অখ্যাত সেনানীদের সংগে একত্রে নিদ্রামগ্ন।

জীবিত অবস্থায় কুমারী এমিলি ছিলেন একটি ঐতিহ্য; কর্তব্য ও যত্নের বস্তু; যেন গোটা শহরটির

একধরণের বাধ্যবাধকতা। ১৮৯৪ সালের সেই দিনটি থেকে, যেদিন কর্নেল সারটোরিস, মেয়র,—যিনি বিধান দিয়েছিলেন নিগ্রো মেয়েরা এপ্রণ ছাড়া রাস্তায় বার হ'তে পারবে না—তার খাজনা চিরকালের জন্য মকুব করে দিলেন। এই নয় যে কুমারী এমিলি কোন দানগ্রহন করেছিলেন। কর্নেল সারটোরিস আসলে একটা ঘোরালো গল্প ফেঁদেছিলেন যে কুমারী এমিলির বাবা নাকি অতীতে শহরকে বেশ কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন এবং শহরের লোক সেই ঋণ এইভাবে শোধ দিতে মনস্থ করেছে। কর্নেল সারটোরিসের যুগ এবং চিন্তাধারার লোকই কেবল এহেন একটি গল্প উদ্ভাবন করতে পারত এবং স্ত্রীলোক বলেই এটি সত্য হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হ'য়েছিলো।

পরবর্তী যুগের লোকেরা যখন তাদের আধুনিক চিন্তাধারা নিয়ে পৌরপিতার আসনে বসলো তখন উপরোক্ত বন্দোবস্ত তাদের মধ্যে বেশ-একটু অসন্তোষ সৃষ্টি করলো। প্রথম বছর তারা কুমারীর এমিলিকে ডাকযোগে খাজনার নোটিশ পাঠালো। ফেব্রুয়ারী মাস হ'য়ে গেল, তবু নোটিশের কোন উত্তর এলো না। তখন তারা আরেকটি চিঠিতে তাকে শেরিফের অফিসে আসতে নির্দেশ দিলো। এক সপ্তাহ পরে শহরের নোতুন মেয়র নিজেই তার সংগে অফিসে অথবা কুমারী এমিলির বাড়িতে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে পত্র দিলেন। দরকার হ'লে তিনি গাড়ী পাঠাবেন—এও জানালেন। এর প্রত্যুত্তরে তিনি পেলেন একটি প্রাচীন কাগজে বিবর্ণ কালিতে প্রাচীন সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা এক ছত্র। কুমারী এমিলি জানিয়েছেন, আজকাল তিনি আর বাইরে যান না। খাজনার নোটিশটিও চিঠিখানির সংগে ছিলো,—কোন মন্তব্য কিছু লেখা ছিলো না তাতে।

তারা একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকলেন পৌরপিতাদের। তার কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হলো। তারা তার দরজায় করাঘাত করলো, যেখানে আট-দশ বছর আগে তিনি চৈনিক চিত্রাঙ্কন শেখানো বন্ধ করার পর কোন আগন্তুক পদার্পণ করে নি। বৃদ্ধ নিগ্রোটি তাদের একটি স্বল্পালোকিত হলঘরে নিয়ে গেলো, যেখান থেকে একটি সিঁড়ি আরো অন্ধকারের দিকে উঠে গেছে। ঘরটিতে ধুলো এবং অব্যবহারজনিত এক ধরণের গন্ধ,—কেমন যেন চেনা এবং কটু। আসবাবপত্র ভারী এবং চর্ম আচ্ছাদিত। নিগ্রোটি যখন একটি জানালার পর্দা সরালো তখন তারা দেখলো আসবাবপত্রের আচ্ছাদনে কাটল ধরেছে। যখন তারা বসল, মৃদু ধুলো তাদের উরুতের আশে-পাশে ধীরে ধীরে, যেন অনিচ্ছাসহকারে, উঠল, তারপর জানালা দিয়ে আসা এক-চিলতে রোদে অত্যন্ত ধীর গতিতে একভাবে পাক খেতে লাগল। ফায়ারপ্লেসের উপর নিষ্প্রভ পিল্টি-করা ইজেলের উপর ছিলো কুমারী এমিলির পিতার যেমন প্রতিচ্ছবি।

যখন তিনি প্রবেশ করলেন, তারা উঠে দাঁড়ালো। কালো পোষাকে মোটা ছোটখাট একটি স্ত্রীলোক, সরু সোনার শিকলি কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে এবং তারপর তার কোমর বন্ধনীর মধ্যে হারিয়ে গেছে: নিষ্প্রভ সোনার মাথাওলা একটি ছড়ির ছড়িতে তিনি ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তার কাঠামোটি ছোটখাটো হওয়াতে বা অপরের কাছে পুষ্টি তার কাছে দুলভ। তাকে ফেঁপে-ওঠা মনে হচ্ছিল—যেন নিষ্পন্দ জলে একটি দেহকে বহুকাল ডুবিয়ে রাখা হ'য়েছে: রঙটাও যেন তেমনি। যখন তারা তাদের আগমনের হেতু বলছিলো তার চোখদুটি একে একে তাদের পর্যবেক্ষণ করছিলো। তখন মুখের স্থূল পেশীর আবর্তে তার চোখদুটিকে মনে হচ্ছিল একজন কাদায় পুঁতে-ফেলা দুটো ছোট কচ্ছপের টুকরো।

তিনি তাদের বসতে বললেন না। তাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং ধীরভাবে তাদের প্রতিটি কথা শুনলেন, যতক্ষণ না তারা একসময় থমকে থেমে গেল। তারা তার চেনের প্রান্তে লাগানো অদৃশ্য ঘড়িটির টিকটিক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল।

যখন তিনি কথা বললেন, তার কণ্ঠস্বর শুষ্ক, বিরক্তাপ। "জেফারসনে আমার কোন খাজনা নেই। কর্নেল সারটোরিস নিজে আমাকে ব'লেছেন। প্রয়োজন হয় আপনারা যে কেউ শহরের রেকর্ডপত্র দেখতে পারেন।"

"আমরা দেখেছি মিস্ এমিলি, আমরাই শহরের অধিকর্তা। আপনি শেরিফের সই-করা নোটিশ পান নি?"

"হ্যাঁ, আমি একটা কাগজ পেয়েছিলাম বটে।" কুমারী এমিলি বললেন। "বোধহয় ভদ্রলোক নিজেকে শেরিফ মনে করেন।.....জেফারসনে আমার কোন খাজনা নেই।"

"কিন্তু আইনে কোন কিছু এরকম নেই। আমাদের তো—"

"কর্নেল সারটোরিসকে বলুন গিয়ে। জেফারসনে আমার কোন খাজনা নেই।"

"কিন্তু মিস্ এমিলি..."

"কর্নেল সারটোরিসের সংগে দেখা করুন।" (কর্নেল সারটোরিস প্রায় দশ বছর পূর্বে মারা গেছেন।) "জেফারসনে আমার কোন খাজনা নেই। টোবে!" নিগ্রোটি এসে দাঁড়ালো। "এই ভদ্রলোকদের বাইরে নিয়ে যাও।"

(২)

অতএব এই ভাবে তিনি (এত প্রতাপ প্রতিপত্তি সত্ত্বেও) তাদের পরাভূত ক'রলেন। ঠিক এমনি ভাবে ত্রিশ বছর আগে তিনি সেই দুর্গন্ধটি সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষদের পরাভূত করেছিলেন। সেটি ছিলো তার পিতার মৃত্যুর দু'বছর পরের ঘটনা,—তিনি যাকে বিবাহ ক'রবেন মনস্থ করেছিলেন সে তাকে পরিত্যাগ করার অল্পদিন পরেই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি খুব কমই বাইরে যেতেন: ভাবী স্বামী চলে যাবার পর লোকে তাকে কদাচিৎ দেখেছে। দু'চারজন মহিলা সমবাথা জানাতে গেছেন, কিন্তু ঘরে প্রবেশাধিকার পান নি। বাড়িটিতে কেউ বাস করে ব'লে মনে হতো না। একমাত্র জীবনের লক্ষণ ছিলো নিগ্রো চাকরটি,—তখন সে যুবক,—বাজারের থলি হাতে যাওয়া-আসা করতো।

"পুরুষমানুষ কি আর ছেঁদেল সামলাতে পারে," মহিলারা বলাবলি করতেন। সুতরাং দুর্গন্ধ যখন শুরু হ'লো তারা খুব-একটা বিস্মিত হলেন না। উচ্চতলার গর্বিত শ্রীয়ারসন পরিবারের সংগে বাইরের আঁটশৌরে জনমণ্ডল জগতের আরেকটি যোগসূত্র রচিত হ'লো।

একজন মহিলা প্রতিবেশী শহরের মেয়র আশি বছরের বুড়ো বিচারপতি স্টিভেন্সকে এ সম্পর্কে অভিযোগ জানালেন।

"এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি বলুন।" তিনি বললেন।

"কেন, ওঁকে এই দুর্গন্ধ বন্ধ করতে বলুন। এ সম্পর্কে কোন আইন নেই?"

"এ সবের দরকার হ'বে না, "বিচারপতি স্টিভেন্স বললেন, "হয়ত একটা সাপ বা ইঁদুর ওঁর ওই বিপত্নীটা গেলে রেখেছে কোথাও। আমি ওকে বলে দেবো।"

পরদিন তিনি আরো দুটো অভিযোগ পেলেন, তাদের মধ্যে একটি জনৈক ভদ্রলোকের, তবে- সুরটা একটু অন্যরকম। "আমাদের এটা বন্ধ করতেই হবে মাননীয় জজসাহেব। আমি অবশ্যই মিস এমিলিকে বিরক্ত করতে চাই না। তবু আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।"

সেই রাত্রেই পৌরপিতাদের অধিবেশন বসলো,—পৌরপিতাদের তিনজন পদাধিকার: একজন যুবক, নোতুন যুগের প্রতিভূ।

সুতরাং পরদিন মধ্যরাত্রির পর চারজন লোক কুমারী এমিলির বাগান পেরিয়ে বাড়িটির আশেপাশে কিছুক্ষণ চোরের মত ঘোরাঘুরি করলো এবং আশপাশ শুঁকতে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন তার কাঁধ থেকে ঝোলানো একটা ঝুলি থেকে ইঁটের আনাচে-কানাচে একটি সাদা রঙের পাউডার ছড়াচ্ছিলো। সেলারের দরজা ভেঙে সেখানেও খানিকটা ছড়ালো,—বহির্বাটির নানা স্থানেও। যখন কাজ সেরে আবার বাগান পেরোচ্ছে, তারা দেখল বাড়িটির একটি জানালা খোলা,— পূর্বে অন্ধকার ছিলো এখন সেটি আলোকিত,—কুমারী এমিলি সেখানে বসে আছেন, বাতিটি ঠিক তার পিছনে, তার শরীর ঋজু, নিস্পন্দ,—তাকে একটি প্রস্তর মূর্তির মতো দেখাচ্ছিলো। তারা চুপিসারে বাগান পেরিয়ে রাস্তার কিনারাবর্তী ঘন লোকাস্টের ছায়ার আড়ালে মিশে গেলো। দু'এক সপ্তাহ পরে দুর্গন্ধও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো।

বহুলোক বাস্তবিকই তার জন্য দুঃখবোধ করতো। তার মাতামহী বৃদ্ধা ওয়াট শেষটায় পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন। কুমারী এমিলির ক্ষেত্রেও একই পরিণতির কথা চিন্তা করে অনেকে ভাবতো যে গ্রীয়ারসন পরিবার যতটা নিজেদের উঁচু ও মর্যাদাসম্পন্ন ভাবে তারা আদপে ততটা নয়। শহরের কোন যুবককে কুমারী এমিলির যোগ্য ভাবা হয় নি। আমরা সবসময়েই তাদের ছবির ফ্রেমের লোক ভেবেছি : শুভ্রবেশ পরিহিতা কৃশতনু কুমারী এমিলি ঘোড়ার চড়ে পিছনে পিছনে যাচ্ছেন, তার বাবা আগে আগে ছায়ামূর্তির মতো, পিঠ তার দিকে, ঘোড়ার চাবুক হাতে,—তাদের পিছনে ছবির ফ্রেমের মতো সদর দেউটি, তাদের ছবি যেন ঘরে রেখেছে!

সুতরাং তার বয়স যখন ত্রিশ হলো এবং বিয়ের পাত্র জুটলো না আমরা তখন ঠিক খুশী হই নি, তবে আমাদের ভাবনা বাস্তবায়িত হ'তে ভালো লেগেছিলো ঠিকই। পরিবারে পাগলামি থাকলেও বিয়ের সব প্রস্তাবগুলি —সেগুলি যদি সত্যসত্যই আসতো—কুমারী এমিলি নিশ্চয়ই প্রত্যাখান করেন নি।

পিতৃপ্রয়াণের পর গুজব রটলো যে তার পিতা বসতবাটি ছাড়া আর কিছু তার জন্য রেখে যান নি ; এবং লোকেরা, এক অর্থে, খুশীই হলো। অবশেষে কুমারী এমিলিকে অনুকম্পা করার সুযোগ মিললো। নিঃসঙ্গতা এবং আর্থিক অনটন এবার তাকে মানবিক করবে। এখন তিনি অর্থের চিরাচরিত মূল্য—প্রাপ্তির আনন্দ এবং না-থাকার হতাশা—মোটামুটিভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পিতৃপ্রয়াণের পরদিন মহিলারা সব তার বাড়িতে গেলেন তাকে সমবেদনা জানাতে,—যেমন আমাদের প্রথা। কুমারী এমিলি তাদের সংগে দরজার নিকটে দেখা করলেন,—আগেকার মতোই পোষাক এবং মুখমণ্ডলে দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি তাদের জানালেন যে তার বাবা মারা যান নি। তিন দিন ধরে পাদ্রী এবং ডাক্তারদের উপরোধ-অনুরোধে কর্ণপাত না করে তিনি ক্রমাগত একই কথা বলে যেতে লাগলেন। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য নিয়ে যেতে দিলেন না। শেষটায় আইনের সাহায্য নেওয়া হবে বলাতে তিনি ভেঙে পড়লেন এবং সেই সুযোগে তার পিতার মৃতদেহ তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করা হলো।

আমরা তখন তাকে পাগল বলি নি। আমরা ভেবেছিলাম এ স্বাভাবিক। কতো যুবককে তার বাবা তাড়িয়েছেন। এখন যখন কেউ নেই তখন যে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে তাকেই আঁকড়ে ধরা ছাড়া গতি কি। আমরা সবাই একমত হ'য়েছিলাম, এ তো স্বাভাবিক।

(৩)

কিছুদিনের জন্য তিনি অসুস্থ ছিলেন। তারপর যখন তাকে দেখলাম তখন তার চুল ছোট করে ছাঁটা। তাকে বালিকার মতো দেখাতো, এবং কোথায় যেন তার একটা সাদৃশ্য ছিলো গীর্জার জানালার গায়ে আঁকা পরী-গুলোর সংগে,—কেমন যেন শোকাহত এবং পবিত্র।

শহরে তখন সবেমাত্র পায়ে-চলা রাস্তা বানানোর চুক্তি সম্পাদিত হ'য়েছে। সেই প্রীয়েই, তার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পর, রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হলো। ঠিকাদারী সংস্থাটি নিগ্রো ও খচ্চরের দল, বহস্পতি এবং হোমার ব্যারণ নামধেয় এক ঠিকাদারসহ এসে উপস্থিত হ'লো। হোমার ব্যারণ একজন ইয়াঙ্কি,—বিশালকায়, রোদে-পোড়া একজন সক্ষম পুরুষ, যার উঁচু গলার স্বর, আর চোখের রঙ, মুখের রঙের সংগে বেমানান, তরল। সে যখন গাইতি দিয়ে মাটি কোপানোর তালে তালে গান গাইতো তখন শহরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চারিপাশে ভিড় করতো। শেষকালে এমন হলো যে যেখানেই উচ্চ হাসি এবং ছেলেছোকরার ভিড় সেখানেই দেখবে হোমার ব্যারনকে। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে এবং কুমারী এমিলিকে মানান-সই ঘোটকচালিত হলদে···রঙের গাড়িতে রবিবারের বিকালে বেড়াতে দেখা গেল।

প্রথমে আমরা খুশী হ'য়েছিলাম, যাক্, এতদিনে কুমারী এমিলির তবু একটা আকর্ষণ জুটলো, কেননা মহিলারা সবাই একবাক্যে বললেন, "প্রীয়ারসন পরিবারের কেউ নিশ্চয়ই উত্তরদেশবাসী কাউকে গভীরভাবে গ্রহণ করবে না। তাও লোকটি যদি আবার দিনমজুর না হ'তো।" কিন্তু যাদের একটু বয়স হ'য়েছে তারা বলতে লাগলেন যে চরম শোক সত্ত্বেও একজন সত্যিকারের অভিজাত মহিলার নিজ আভিজাত্য ভোলা উচিত নয়। তারা অবশ্য "আভিজাত্য" শব্দটি ব্যবহার করলেন না। তারা বললেন, "বেচারা এমিলি! এবার তার আত্মীয়দের এখানে আসা উচিত।" কুমারী এমিলির কিছু আত্মীয় ছিলো আলাবামায়। কিন্তু বহু বছর আগে তার বাবা বৃদ্ধ ওয়াট যিনি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন তার সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ওদের সংগে ঝগড়া করেছিলেন, এবং তারপর থেকে দুই পরিবারের মধ্যে কোনপ্রকার সম্পর্ক ছিলো না। এমন কি কুমারী এমিলির পিতার শ্রাদ্ধেও ওরা কেউ আসেন নি।

যেই বুড়োরা বলতে আরম্ভ করলো, "বেচারা এমিলি," সংগে সংগে ফিসফাস শুরু হলো। "এটা কি সত্যিই তাই নাকি?" "নিশ্চয়ই তাই। এছাড়া আর কি হ'তে পারে।" এসব অবশ্য অন্তরীক্ষে'—শকটের পিছনের টানটান সিল্ক এবং সাটিনের গমগম শব্দ বৈকালিক রবিবাসরীয় সূর্যের উপর এসে যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ত, ঠিক যখন সাজানো অশ্বশকটটির ক্ষীণ এবং দ্রুত ক্লপ্-ক্লপ্ শব্দ তাদের পাশ দিয়ে চলে যেত। "বেচারা এমিলি," তারা বলত।

তিনি অবশ্য তার মাথা বরাবর উঁচু রেখেছিলেন—যখন আমরা মনে করেছিলাম তার পতন হ'য়েছে, তখনও। মনে হতো শেষ প্রীয়ারসন হিসাবে মর্যাদার স্বীকৃতি তিনি যেন আরো বেশী ক'রে চান। যেন বৃত্তিকার স্পর্শে তার কিছু এসে যায় না। যেমন ধরুন তিনি যখন ইঁদুর-মারা বিষ, আর্সেনিক, কিনতে গেলেন। এটি যখন তাকে সবাই "বেচরা" বলতে আরম্ভ করেছে তার বছর খানেকের কিছু বেশী পরের ঘটনা। দুজন আত্মীয়া তখন তার কাছে প্রায়শই আসা-যাওয়া করতো।

"আমার কিছু বিষ চাই।" তিনি ঔষধালয়ের মালিককে বললেন। তখন তার বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেছে,—শরীর তখনও কৃশ, সচরাচরের চেয়ে কৃশতর—ঘাড়ের কাছে চামড়া টানটান হ'য়ে আছে; অক্ষিগোলকদ্বয়—আলোকস্তম্ভ পরিচালকের যেমন হওয়া উচিত, তেমনি। "আমার কিছু বিষ চাই।"

"নিশ্চয়ই মিস এমিলি। কি ধরণের বিষ? ইঁদুর বা এই ধরণের কিছুর জন্যে? আমার মনে হয়—

"সবচেয়ে ভালো যা আছে। যে কোন ধরণের।"

ঔষধবিক্রেতা নানান বিষের নাম করলো। "এগুলো একটি হাতিকেও মারতে পারে। আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে—"

"আর্সেনিক।" কুমারী এমিলি বললেন। "এটা কি ভালো?"

"আর্সেনিক কি—। হ্যাঁ ম্যাডাম। কিন্তু আপনি যা চান তা হচ্ছে—

"আমি আর্সেনিক চাই।"

ঔষধবিক্রেতা তার দিকে তাকালো। তিনি তার দিকে তাকালেন। সোজাসুজি তার মুখ টানটান পতাকার মতো। "নিশ্চয়ই ম্যাডাম। কিন্তু আইন অনুযায়ী আপনাকে বলতে হবে আপনি কি জন্যে এ বিষ চান।"

কুমারী এমিলি তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন,—মাথাটা পিছন দিকে একটু হেলিয়ে, চোখে চোখে রেখে, যতক্ষণ লোকটি চোখ না নামিয়ে নিলো এবং আর্সেনিক আনতে ভিতরে গেল. দোকানের নিগ্রো চাকরটি প্যাকেট এনে দিল : মালিক এলো না। যখন কুমারী এমিলি বাড়ি ফিরে প্যাকেটটি খুললেন তখন দেখলেন বাক্সটির উপর মাথার খুলি আর হাড়ের ছবির ঠিক নীচে "ইঁদুরের জন্য" এই কথাটি লেখা আছে।

(৮)

এইবার আমরা সবাই বললাম, "এ আত্মহত্যা করবে"। আমরা বললাম. এই সবচেয়ে ভালো। যখন তাকে হোমার ব্যারনের সংগে দেখেছিলাম আমরা বলেছিলাম, নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাবেন। কেননা হোমার ব্যারন নিজেই একবার ব'লেছিলো যে বিয়ে-করার লোক নয়। সে পুরুষদের পছন্দ করে. এবং সবাই জানতো সে ইলকস্ ক্লাবে কমবয়সী ছেলেদের সংগে আড্ডা দেয়, মদ খায়। শেষটায় আমরা বললাম, "বেচারা এমিলি" শকটাচ্ছাদনের পিছনে অবশ্য, যখন প্রতি রবিবার কুমারী এমিলির ফিটনকে শকটটি আমাদের পাশ দিয়ে চলে যেত। কুমারী এমিলির অদ্ভুত ভংগি হোমার ব্যারনের মাথায় উঁচু-চাঁছাছোলা টুপি, দাঁতের ফাঁকে চুরুট এবং হলদে দস্তানা-পরা হাতে চাবুক।

এই সময় কিছু মহিলা বলতে লাগলেন যে এতে শহরের নাম ডুবছে এবং শহরের তরুণদের পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ মঙ্গলজনক নয়। পুরুষেরা এ বিষয়ে মাথা গলাতে চাইল না। কিন্তু মহিলারা শেষ পর্যন্ত শহরের পাদ্রীকে বাধ্য করলো তার কাছে যেতে। সাক্ষাত করে কি ঘটেছিলো তা অবশ্য কোনদিনই জানা যায় নি. তবে পাদ্রীমশাই আর কখনো কুমারী এমিলির কাছে যান নি। পরের রবিবার কুমারী এমিলি যথারীতি হোমার ব্যারনের সংগে অশ্বশকটে সওয়ার হলেন এবং পরদিন পাদ্রীর স্ত্রী আলাবামার কুমারী এমিলির আত্মীয়দের কাছে পত্র পাঠালেন।

কুমারী এমিলির বন্ধুদের অনেকের আবার তার দ্বারস্থান ছায়ায় দেখা গেল। এবং আমরা পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য উৎসুক হলাম। প্রথমে কিছুই ঘটল না। অতঃপর আমরা নিশ্চিত হলাম যে ওরা বিয়ে করবেন। শুনলাম যে স্বর্ণকারের কাছে কুমারী এমিলি পুরুষমানুষের রুপোর টয়লেট দ্রব্যাদির জন্য বায়না দিয়েছেন যার প্রত্যেকটির উপর ইংরাজী "এইচ. বি." অক্ষর দুটি খোদিত থাকবে। দু'দিন পরে শুনলাম তিনি পুরুষমানুষের এক প্রস্থ কশাঘাতোপযোগী, আর নৈশবাস পর্যন্ত, কিনেছেন। আমরা আজ বলাবলি করলাম, "ওরা তাহলে বিয়ে করে ফেলেছে।" বাস্তবিকই আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম. কেননা কুমারী এমিলি যত না শ্রীমতীয়সন, ওর আত্মীয়রা ছিলেন তার চেয়ে বেশী।

সুতরাং আমরা বিশেষ অবাক হ'লাম না হোমার ব্যারনকে (রাস্তার কাজ ততদিনে সমাপ্ত হয়েছে) যখন আর দেখা গেল না। একটু হতাশ হয়েছিলাম ঠিকই, যেহেতু সামনাসামনি কোন অগ্ন্যুৎপাত ঘটল না। ভাবলাম, কুমারী এমিলিকে গৃহে আনয়নের প্রস্তুতি পর্বের জন্য অথবা তাকে আত্মীয়দের হাত থেকে উদ্ধারের সুযোগ করে দেবার জন্য সে বাইরে গেছে। (ততদিনে আমরা সবাই কুমারী এমিলির দিকে এবং তার আত্মীয়দের বিপক্ষে হ'য়ে গেছি।) এক সপ্তাহ পরে তারা বিদায় নিলো। এবং যেমনটি আমরা আশা করেছিলাম, তিন দিনের ভিতর

হোমার র‍্যানন শহরে ফিরে এলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন প্রতিবেশী দেখ‌ল নিগ্রো চাকরটি তাকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাচ্ছে।

হোমার র‍্যাননকে আমরা সেই শেষ দেখি। কুমারী এমিলিকেও, কিছুদিনের জন্য। নিগ্রোটি আসত—যেত বাজারের ঝুড়ি হাতে, কিন্তু সদর দরজা সব সময়ের জন্য বন্ধ রইল। মাঝে মাঝে আমরা ক্ষণিকের জন্য তাকে জানলার কাছে দেখতাম। যেমন সেদিন চুন ছড়ানোর সময় লোকেরা দেখেছিলো। প্রায় ছয় মাস তিনি বাড়ার বেরোন নি। তখন আমরা বুঝেছিলাম, এ তো স্বাভাবিক। তার পিতার যে গুণ তার কুমারী জীবনকে বারবার ব্যাহত করেছে সেটি তার মধ্যেও প্রচণ্ডরূপে বিদ্যমান এবং সেটি সহজে বিনষ্ট হবার নয়।

তারপর আমরা যখন তাকে দেখি আজ তিনি মুটিয়ে গেছেন এবং চুলও পাকতে আরম্ভ করেছে। পরবর্তী কয়েক বছর তার চুল আরো পাকল, শেষটায় রঙটা হ'য়ে দাঁড়ালো লুন আর গোলমরিচের মতো ধূসর-কালো। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে মরবার দিন পর্যন্ত তার চুলের রঙ ছিলো সতেজ ধূসর-কালো, কর্মঠ-পুরুষের চুলের রঙের মতো।

সেই সময় থেকে তার সদর দরজা বন্ধ থাকত। বছর ছয়-সাত কেবল সেটি তোলা ছিলো, যখন তার বয়স চল্লিশ, যখন তিনি চৈনিক চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা দিতেন। একতলার একটি ঘরকে তিনি স্টুডিও হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং সেখানে কর্ণেল সারটোরিসের সমসাময়িকদের মেয়ে এবং নাতিরা আসত চিত্রাঙ্কণ শিখতে,—নিয়ম করে এবং নিষ্ঠাভরে, যেমন করে তারা পঁচিশ পয়সা হাতে করে গীর্জায় যেতো। ইতিমধ্যে তাকে কর দানের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

তারপর যখন নতুন যুগের লোকেরা শহরের মেরুদণ্ড হ'য়ে দাঁড়ালো এবং কুমারী এমিলির চিত্রাঙ্কণ শিক্ষার্থীদের সংসার হলো, তখন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের রঙের বাক্স, একঘেয়ে তুলি এবং মহিলা ম্যাগাজিন থেকে কাটা ছবি হাতে তার কাছে পাঠাত না। সেই জন্যের ওপর সদর দরজা সেই যে বন্ধ হলো চিরকালের জন্য তা খুললো না। যখন শহরে বিনা খরচে ডাক ব্যবস্থা হলো আজও কুমারী এমিলি তার দরজায় কোন নম্বর প্লেট বা ডাকবাক্স লাগাতে দিলেন না। তাদের কোন কথাই তিনি শুনলেন না।

প্রতিদিন প্রতি মাস প্রতি বছর আমরা নিগ্রোটিকে ধূসর থেকে ধূসরতর হতে, দেখলাম। দেখলাম তাকে কুঁজো হতে, ক্রমশ আরো কুঁজো; প্রতিদিন সে বাজারের ঝুড়ি হাতে যাওয়া-আসা করত একইভাবে। প্রতি ডিসেম্বর আমরা তাকে খাজনার নোটিশ পাঠাতাম; সপ্তাহ শেষে সেটি ফিরে আসত প্রত্যাখাত হয়ে। মাঝে মাঝে আমরা তাকে দেখতাম নীচেতলার জানলাগুলির একটিতে, নিশ্চল খোদাই-করা প্রস্তর মূর্তির মতো,—উপর-তলায় বোধহয় তিনি পুরোপুরিই বন্ধ রেখেছিলেন—মনে হতো আমাদের দিকে চেয়ে আছেন দেখছেন, কখনো-বা মনে হতো দেখছেন না,—কোনটা যে ঠিক বুঝতে পারতাম না। এইভাবে তিনি এক যুগ থেকে অন্য যুগে উত্তীর্ণ হলেন—সবারই প্রিয় তিনি, যিনি নিরুদ্বেগ, শান্ত, অদ্ভুত।

এবং একদা তিনি মারা গেলেন। ধূলো এবং ছায়াপূর্ণ তার নিলয়ে, অথর্ব একটি নিগ্রোর তত্ত্বাবধানে। আমরা জানতে পর্যন্ত পারি নি যে তিনি অসুস্থ; আমরা নিগ্রোটির কাছ থেকে কোন খবর পাবার আশা বহুকাল ত্যাগ করেছিলাম। সে কারো সংগে কোন কথা বলতো না, সম্ভবত কুমারী এমিলির সংগেও, কোনদা তার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলো খসখসে, সম্ভবত ক্রমাগত অব্যবহারের জন্যই।

তিনি মারা গেলেন একতলার ঘরগুলির একটিতে, ভারী আখরোট কাঠের তৈরী খাটের মশারি ঢাকা বিছানায়—ধূসর মশারিটি পুরানো এবং বহুকাল রোদে না দেবার জন্য হলদে এবং চটচটে একটি বালিসের উপর ন্যস্ত।

নিগ্রোটি মহিলাদলের প্রথম দলকে সদর দরজায় আপ্যায়ন করলো এবং তাদের ভিতরে আসতে দিল। তাদের কণ্ঠস্বর চাপা এবং উত্তেজনাপূর্ণ এবং তারা এদিক-সেদিক দ্রুত এবং কুতূহলী দৃষ্টিতে দেখছিলো। নিগ্রোটি চলে এলো। সে হেঁটে চলে গেল বাড়ির মধ্য দিয়ে পিছনে। এবং তারপর থেকে তাকে আর কেউ দেখে নি।

আত্মীয়া দুজন প্রায় সংগে সংগেই চলে এলেন। শ্রাদ্ধের কাজ দ্বিতীয় দিনে স্থির হলো। সমস্ত শহর ছুটে এলো কুমারী এমিলিকে দেখতে। কুমারী এমিলি—বাজার থেকে কেনা পুষ্পস্তূপের নীচে শরীর : তার বাবার ফেরন প্রতিচ্ছবি শবাধারের ঠিক উপর, যেন চিন্তামগ্ন : চারিদিকে চাপা উত্তেজক স্বরে কথনরত মহিলাবৃন্দ—বিচিত্র অনুভূতি উদ্দীপক ; এবং অনেক অতি বৃদ্ধলোক —অনেকে পুরোনো সামরিক পোষাকে—কুমারী এমিলি সম্পর্কে আলোচনারত, যেন তিনি এদের সমসাময়িক, কোন নাচের আসরে দেখা হ'য়েছিলো, হয়ত-বা প্রেম নিবেদন করেছিল কেউ। সময় গুলিয়ে যাচ্ছিলো দ্রুত, এর গাণিতিক চলমানতার সংগে, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে,—অতীত যাদের কাছে কোন ফুরিয়ে-যাওয়া রাস্তা নয়, বরং এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, শীত যাকে স্পর্শ করে না, বর্তমান বৎসরগুলি যার সীমারেখা।

ইতিমধ্যে আমরা জেনে নিয়েছি যে বাড়িটির উপরতলার একটি ঘর আছে যেটি বিগত চল্লিশ বছরে কখনো খোলা হয় নি এবং সেটি খুলতে হ'লে সম্ভবত জোরপ্রয়োগ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কুমারী এমিলিকে যথাযথভাবে সমাধিস্থ না করা হলো ততক্ষণ ওরা সব অপেক্ষা করলো।

দরজা ভাঙতেই তার বাকার ধূলোর স্তরে গেল ঘরটি। যেন কিছুক্ষণ ধরে ধূলো বাতাসে উড়লো, তারপর থিতিয়ে গেল। ঘরটির সর্বত্র যেন কবরখানার ল্যাপ্‌সা মিহি বস্ত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত —বিবর্ণ-হয়ে-আসা গোলাপী রঙের ঝালর দেওয়া পর্দায়, গোলাপী বাতি-আচ্ছাদনে, ড্রেসিং টেবিলে, আলনো—সুঠামভাবে বিন্যস্ত স্ফটিকসমূহে, পুরুষমানুষের টয়লেট দ্রব্যাদিতে,—সর্বত্র ঘরটি যেন বাসরঘর, এমনভাবে সাজানো, টয়লেটদ্রব্যাদির উপর রূপোর খোদিত মনোগ্রাম অব্যবহারের জন্য এত মলিন যে অক্ষরগুলো পড়া যায় না। আর সেগুলোর মাঝখানে একটি সার্টের কলার ও গলাবন্ধ পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিলো সেগুলিকে যেন কিছুক্ষণ আগে খুলে রাখা হ'য়েছে। হাতে নিতে চারিপার্শ্বস্থ ধূলোর সেগুলির ছাপ পড়ল। একটি চেয়ারের উপর পরিধেয় বস্ত্র সযত্নে ভাঁজ করে রাখা, নীচে নির্বাক জুতোজোড়া এবং পরিত্যক্ত মোজা। এবং লোকটি বিছানায় শায়িত।

অনেকক্ষণ ধরে আমরা স্থিরভাবে সেই মাংসবিহীন হাসির দিকে চেয়ে রইলাম। শায়িত,—যেন কাউকে আলিংগন করছে, তারপর একসময় গভীর ঘুম এসে তাকে বোকা বানিয়েছে, -যে গভীর ঘুম প্রেমের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, যে ঘুম প্রেমের বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে। যা অবশিষ্ট ছিলো তা হলো বিছানার সংগে মিশে তার রাত্রিকালীন জামার অবশিষ্টাংশ। বালিশটা ছিলো পাশে, নীরবে ধূলো এসে জমা হ'য়েছিলো তাতে। আমাদের চোখ পড়ল দ্বিতীয় বালিশটিতে। বালিশে মাথার সুস্পষ্ট ছাপ। আমাদের মধ্য থেকে কে যেন সেখান থেকে কি-একটা তুলে নিলো আমরা সবাই তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়লাম দেখবার জন্য। আমাদের নাকে হাল্‌কা অম্ল ধূলো, কটু শুষ্ক। আমাদের চোখের সামনে একটা ধূসর-কালো চুলের গোছা।

আসা আর যাওয়া ॥ স্যামুয়েল বেকেট ॥ অনুবাদ ঃ মনোজ চাকলাদার

বেকেট সম্পর্কে কন রুবি এক আলোচনায় বলেছেন, Fin-de-partie (End Game 1958) পর্যন্ত বেকেট তাঁর নাটকে আরু-আরোপ সীমাবদ্ধতায় রয়েছেন এবং কোন প্রবাহে বেরিয়ে আসার পথ নেই বলে ভবিষ্যৎ সঙ্কেত করেছে লোকেরা। কিন্তু Fin-de-partie-এর মাত্র এক দশক পরে তিনি ভবিষ্যৎ সঙ্কেত সমর্থন করেছেন কি—১৯৬৫তে তিন মিনিটের নাটক আসা আর যাওয়া (come and go) এবং ১৯৬৯তে একটি ত্রিশিশ সেকেণ্ড নাটক শ্বাস (Breath) লিখে? যদিও Breath-এর স্বাভাবিকভাবে তারিখ দেওয়া হয়েছে পিছিয়ে, বেকেট নিজেই ১৯৬৬ এর মে তে কন রুবিকে বলেন। আসা আর যাওয়াকে বেকেট 'dramaticule' শব্দটি দিয়ে চিহ্নিত করেন। এতে তিনটি নারী চরিত্র, যাদের প্রত্যেকের নয়টি কথা একবার প্রস্থান এবং পুনঃপ্রবেশ। তারসাম্য রয়েছে সুন্দরভাবে। যখন প্রত্যেক স্ত্রীলোক মঞ্চের অন্ধকারে আলাদা হ'য়ে যাচ্ছে নিজেদের পালায়, বাকীদের মধ্যে একজন অপরজনের কানে ফিসফিস করে কথা বলে। যে গোপন কথা শুনছে 'ভীত-সন্ত্রস্ত' হ'য়ে, বিস্মিত হ'য়ে উচ্চারণ করে—oh। তারপর সে জিজ্ঞাসা করে অনুপস্থিত ব্যক্তির ভাগ্য সম্পর্কে কি সংশয় প্রকাশ করে। গোপ কথা অজ্ঞতার জন্য আশান্বিত হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসে এবং তিনজন স্ত্রীলোক সামনে মুখ করে বসে থাকে।

এই নাটকে তিনজন স্ত্রীলোক শতাব্দীর-বাঁকের মত কোট এবং টুপী পরিহিত যা চেকভের Three Sisters এর কথা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম সম্পূর্ণ সংলাপের পংক্তি—vi, "when did we three last meet?"—ম্যাকবেথের তিন ডাইনীরই প্রতিধ্বনি। কয়েক পংক্তির পর যেমন Hugh kenner লক্ষ্য করেছেন, স্কুল থেকে তিনজন ছোট্ট কুমারী আসছে। এমন কি লিয়ারের তিনকন্যা আবির্ভূত হচ্ছে যখন দুইজন তৃতীয় জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে মনে হয়। তাদের কয়েক মিনিট মঞ্চে থাকাকালীন, আমরা বিস্মিত হতে পারি যেখানে তারা তিনজন হল অদৃষ্ট-ত্রয়ী। প্রচ্ছন্ন নির্দেশ রয়েছে, তিনটি স্ত্রীলোককে দুর্বলভাবে ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে তাদের নামের প্রথম উচ্চারিত স্বর দিয়ে—ভাই (vi), রু (Ru), ফ্লো (Flo), তারা রহস্যময় সংবাদের জন্য প্রতিযোগিতা করে (vie); তারা দুঃখ (Rue) প্রকাশ করে; জীবন প্রবাহিত হয় (Flow), in the old way তে হাত ধরে সামনে মুখ করে বসে, ফ্লোর চূড়ান্ত সংলাপের জন্য—"I can feel the rings"। "কোন আংটি দেখা যায় না"—বেকেট তার লেখায় উল্লেখ করেন কিন্তু থিয়েটারে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি না।

মঞ্চের অন্ধকারে যেমন তিনজন স্ত্রীলোক আসছে এবং যাচ্ছে, তারা আসছে এবং শাশ্বত অন্ধকারে চলে যাবে। Play এর স্মৃতি ব্যতীত তারা শুধুমাত্র কল্পনা করতে পারবে কিন্তু কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। তাদের এক শব্দ—'oh' (প্রত্যেকেই আলাদাভাবে উচ্চারণ করে)। তাদের বিভিন্ন প্রতিধ্বনিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কখনো মরো যাবে না, তারা কখনো নায়কের সাথে আলোচনা করবে না, তারা কখনো স্বপ্নের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে না। কেউ অন্যের জীবনে যুক্ত হবে না, কাউকে সাহায্যও করবে না। আমাদের মতন তারা 'আসবে আর যাবে' পৃথিবীতে, সংক্ষিপ্তভাবে।

প্যারীতে বেকেট তাঁর নিজের প্রয়োজনায় এই নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলোকে উজ্জ্বল রঙ-এর পোশাক পরিয়েছিলেন আর দিয়েছিলেন পালক যা কিনা পাখীর ভাবনায় থাকে। পরে অবশ্য পোশাকের সৌন্দর্যকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যান, রঙকে মৃদু ক'রে এবং অভিনয় সময়কে ধীরগতিতে সাত মিনিট করে।

॥ চরিত্র ॥

ফ্লো

ভাই

ক

[বয়স, নির্ণয় করা যায় না]

মঞ্চের মাঝখানে পাশাপাশি বাঁ দিক থেকে ফ্লো, ভাই ও ক বসে আছে। বেশ সোজাভাবে, সামনের দিকে মুখ, হাত দুটো কোলে, আঙুলের মধ্যে আঙুল।

নিস্তব্ধতা

ভাই ॥ আমাদের তিনজনের শেষ দেখা কখন হয়েছিল ?

ক ॥ আমরা কথা বলব না।

নিস্তব্ধতা

ভাই ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিস্তব্ধতা

ফ্লো ॥ ক !

ক ॥ বলো !

ফ্লো ॥ ভাইয়ের সম্পর্কে কি ভাবছ ?

ক ॥ একটু পরিবর্তন দেখছি ! [ফ্লো মধ্যের আসনে আসে, কয়ের কানে ফিসফিস করে। ভীত সহস্র] ওঃ ! [তারা উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায়। ফ্লো তার আঙুল ঠোঁটে রাখে] সে কি কিছু বুঝতে পারেনি ?

ফ্লো ॥ ঈশ্বর জানেন !

[ভাই এসে ঢোকে। ফ্লো ও ক পেছন থেকে সামনে ঘোরে, আবার একই ভঙ্গিমা। ভাই ডানদিকে বসে।]

নিস্তব্ধতা

ফ্লো ॥ আমরা যেমন মিল ওয়েডের খেলার মাঠে বসতাম ঠিক তেমনই আবার একসঙ্গে বসেছি, না ?

ক ॥ হ্যাঁ, গুড়ির উপর।

নিস্তব্ধতা

[ফ্লো বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

নিস্তব্ধতা

ক ॥ ভাই !

ভাই ॥ বলো !

ক ॥ ফ্লোকে তুমি কেমন দেখছ ?

ভাই ।। তাকে আগের চেয়ে একটু বেশী [ক্রু মধ্যের আসনে আসে। ভাইয়ের কানে ফিসফিস করে। ভীত সন্ত্রস্ত] ওঃ ! [তারা উভয় উভয়ের দিকে তাকায়। ক্রু তার আঙুল ঠোঁটে রাখে] তাকে কি বলা হয়নি ?

ক্রু ।। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় :

[ক্লো এসে ঢোকে। ক্রু ও ভাই সামনের দিকে ঘোরে। আবার একই ভঙ্গিমা। ক্লো বাঁয়ে বসে।]

নিস্তব্ধতা

ক্রু ।। হাতগুলো ধরা...সেই ভাবেই

ক্লো ।। স্বপ্নের.....ভালবাসা

নিস্তব্ধতা

[ক্রু ডান দিকে বেরিয়ে যায়]

নিস্তব্ধতা

ভাই ।। ক্লো !

ক্লো ।। বলো !

ভাই ।। ক্রুকে কেমন দেখাচ্ছে, কি মনে করছ তুমি ?

ক্লো ।। এই আলোতে কি ঠিক ভাবে দেখা যায় ? [ভাই মধ্যের আসনে বসে। ক্লোর কানে ফিসফিস করে। ভীতসন্ত্রস্ত] ওঃ [উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায়। ভাই তার আঙুল ঠোঁটে রাখে] সে কি জানে না ?

ভাই ।। ঈশ্বরের দোহাই, না।

[ক্রু এসে ঢোকে। ভাই ও ক্লো সামনের দিকে ঘোরে। আবার আগের মত। ক্রু ডানদিকে বসে]

নিস্তব্ধতা

ভাই ।। আমরা কি পুরোনো দিনের কথা বলতে পারি না ? [নীরবতা] বারে বারে এসেছিল ? [নিস্তব্ধতা] পুরোনো কায়দায় কি আবার আমরা আমাদের হাত ধরবো ?

এক মুহূর্ত পরে তারা নীচের নির্দেশ মত হাত ধরে—ভাইয়ের ডান হাত ক্রুয়ের ডান হাতে। ভাইয়ের বাঁ হাত ক্লোয়ের বাঁ হাতে। ক্লোয়ের ডান হাত ক্রুয়ের বাঁ হাতে। ভাইয়ের হাতগুলো ক্রুয়ের বাঁ হাত এবং ক্লোয়ের ডান হাতের উপরে। তিন জোড়া হাত আঙুলের মধ্যে আঙুল গলিয়ে তিনজনের কোলে থাকে।

নিস্তব্ধতা

ক্লো ।। আমি আংটিগুলো অনুভব করতে পারছি।

নিস্তব্ধতা

[যবনিকা]

নির্দেশ

॥ প্রাথমিক অবস্থান ॥

ক্রো	ভাই	ক
ক্রো		ক
	ক্রো	ক
ভাই	ক্রো	ক
ভাই		ক
	ভাই	ক
ভাই	ক	ক্রো
ভাই		ক্রো
	ভাই	ক্রো
ক	ভাই	ক্রো

আলো

নরম আলো, শুধুমাত্র উপর থেকে এবং অভিনীত স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মঞ্চে বাকী অংশটুকু যতটা সম্ভব অন্ধকার থাকবে।

পোশাক

ফুল-লেন্থ কোট, হাই বটন। মেটমেটে বেগুনী (ক), মেটমেটে লাল (ভাই) মেটমেটে হলুদ (ক্রো)। মুখকে ঢেকে রাখতে পারে এমন কিনারা উঁচু করা টুপী। তিনজনের চরিত্র অনুযায়ী যতটা সম্ভব রং আলাদা রাবার সোলের হালকা জুতো। হাতগুলো যতটা সম্ভব দৃশ্যের মধ্যে আনতে হবে। কোন আংটি দেখা যাবে না॥

আসন

বেঞ্চের মত সরু আসন। হেলান দেবার কিছু নেই। তিনজন প্রায় ছুঁয়ে থাকতে পারে এমন লম্বা ব্যবস্থা। যতটা সম্ভব কম দেখা যাবে। যার উপর বসে থাকবে তা কখনই পরিষ্কার হবে না।

বাহির

মঞ্চের বাইরে এদের দেখা যাবে না। কয়েক পা যাওয়ার পর আলোকিত স্থান হতে তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে। এমন অন্ধকার হবে না যা তাদের একেবারেই অদৃশ্য করবে। যতটা সম্ভব দেখা যাবে মঞ্চের উপর। বাহির ও প্রবেশ ধীরে হবে, কোন পায়ের শব্দ হবে না।

ওঅহ (Obs)

তিনটি ভিন্ন শব্দে উচ্চারিত হবে।

কণ্ঠস্বর

শোনা যাবে এমন সুসংহত কণ্ঠ। যতটা সম্ভব নীচু গলায়। বৈচিত্র্যহীন। শুধুমাত্র ওঅহ তিনটি এবং তারপরবর্তী ছুটো লাইন ব্যতীত।

ধূসর নীলিমা ॥ ল্যাংস্টোন হিউজেস ॥ অনুবাদ ॥ অমল চক্রবর্তী

[জীবৎকাল ১৯০২-১৯৬৭ । আমেরিকার কবি । প্রথম জীবনে নাবিক এবং পাচক হিসেবে দিন কাটত । পরবর্তীকালে ভ্যাচেল লিণ্ডসে-র উৎসাহে কাব্যচর্চায় শুরু । প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁর কবিতা ভরপুর । আমেরিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি মুক্তকণ্ঠ ছিলেন । মার্কসীয় দর্শনে তিনি দীক্ষিত পুরুষ । প্রথম কাব্যগ্রন্থ The weary Blues প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে ।]

আজ আমাদের পেতেই হবে স্বর্ণভূমি সূর্যময়া
জমকালো প্রাণ আলোয় ভরা
স্বচ্ছ অমল সলিল ঘেরা স্বপ্নভূমি ;
গাঁয়ের আলো লজ্জারাগে
ঢেউ তুলিয়ে যায় যেখানে
দুলদুলে তার রঙীন রুমাল
সোনায় ভরা ফুল বরানো,
জীবন যেথায় নয়কো এমন মৃত্যুনীরব হিমজমানো ।

আজ আমাদের পেতেই হবে সজীবভূমি শ্যামবনানীর
মনমাতানো বৃক্ষরাজির
শাখায় শাখায় বুকনাচানো হাজার পাখির কলকাকলী
উজ্জ্বল নীল দিনের মতন,
যেথায় পাখি নয়কো এমন ধূসর ধূসর ক্লান্ত-চরণ ।

আজ আমাদের পেতেই হবে জয়জয়ন্তী প্রাণের দেশ
ভালবাসার হাসিখুশির যৌবদিনের সঙ্গীতের
প্রাণের পারে নেইকো যেথা এমন বাঁধন বৃদ্ধনের ।

হে মাধুরী, ঘুরেই যবে !
হে পরমা অন্তলীনা, ঘুরেই যবে !

মধুশালা ॥ ডঃ তাসীর ॥ অনুবাদ ॥ পুষ্পিত মুখোপাধ্যায়

[উর্দু কবিতাকে যারা নতুন করে প্রাণ দান করেছেন ডঃ তাসীর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে থাকাকালীন ডঃ মুলুকরাজ আনন্দ এবং সৈয়দ সাজ্জাদ জহীরের সঙ্গে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। পাকিস্তানের তো বটেই এমন কি অবিভক্ত ভারতের উর্দু কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। ১৯৫০ সালে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান]

তোমার প্রতিটি পেয়ালায় সমান মজা হে সাকী,
দাও দাও আরো কিছু দাও,
মুগ্ধ হয়ে বসে আছে পুরানো মাতালরা
আর কি নতুন কোন নেশা নেই, তোমার কাছে ?

সেই মেপে মেপে বেচা
বুদ্বুদে পুরানো ভঙ্গিমা,
প্রভুত্ব এবং গোলামীর সেকল,
সেই বান্দা আর তার ঈশ্বর
তৃষিত প্রাণে প্রাণে যে আঁধার বিষয়—
এই কি তোমার সাধ্য অমৃতের, সাকী !

তুলে দাও এ দোকান তুমি
শুধু লাভ লোকসানের দাবী
এই দুঃখ, ঐ ভয়
করো দূর, দূর করো সাকী
সামনে জনতার ইপ্সিত দিন।

আজকের তাম্রপর্ণী হয়ে যাবে
বিবর্ণ মদীলীন, বাসি ;
অসহায় ভিক্ষা চাওয়া, তোমার প্রলেপ,
জীর্ণ কারবাকামুন-থাক পড়ে থাক
হে বন্ধু আমার, কি হবে অস্তিম পরিণাম ?

আবার বসন্ত এলো,
গেল ছিঁড়ে জামার পকেট, আকণ্ঠ তন্দ্রতা,
মজনু আবার হবে অরণ্যের সোনাঝরা দিন
খেলব নতুন খেলা, নয়া নয়া হোলী
ওরে মাতালরা ! শুভখবর, শুরু হবে নতুন তামাসা !

ফৈজ আহমদ "ফৈজ" ॥ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইকবালের পর যে কবি উর্দু কাব্য সাহিত্যে আলোড়ন এনেছেন—তিনি হলেন "ফৈজ"। তাঁর জন্ম ১৯১১ সালে অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত শিয়ালকোটে। শিক্ষা মুচমিশন হাইস্কুল, শিয়ালকোট ও গভর্নমেন্ট কলেজ, লাহোর। ফৈজ ভারতীয়ন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্য ও আরবীতে এম-এ। শিক্ষকতায় তাঁর জীবনের আরম্ভ। এম.এ.ও. কলেজ, অমৃতসর এবং হেলী কলেজ লাহোর এ ১৯৩৪ সন থেকে ১৯৪২ সন পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। তারপরই সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ সন থেকে ১৯৪৭ তাঁর জীবন সামরিক বাহিনীতে কাটে। পরবর্তীকালে তিনি বেছে নেন সম্পাদনাকে নিজের জীবিকা রূপে। সম্পাদনা করেন পাকিস্তান টাইম্‌স ও "ইমরোজ"। আজও তিনি "ইমরোজের" সম্পাদক। কিন্তু ফৈজের জীবনে রাজনীতিও অনুপ্রবেশ করেছিল। তিনি কম্যুনিষ্ট আদর্শ ভাবাপন্ন। আর সে জন্যই তাঁকে জড়ান হয়েছিল বিখ্যাত রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায়। এই মামলায় তাঁর জেল হয়। কারাগারে কাটে ১৯৫ থেকে ১৯৫৫। জেলেই তাঁর অনেক কবিতার জন্ম।

ফৈজ এর প্রথম কাব্য গ্রন্থ "নক্শে ফরিয়াদী"। এই কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লেখেন "শের লিখনা জুর্ম ন সহী। লেকিন বেবজহ শের লিখতে রহনা আয়াসী অকল মন্দী তী নহীঁ হায়" অর্থাৎ "কবিতা লেখা অপরাধ নয়। কিন্তু বিনা কারণে কবিতা লেখা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।" কবির এই উক্তি কবিতা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খুব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে।

১৯৪২ সালে ফৈজ যখন জেলে তখন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "দস্তেসবা" প্রকাশিত হয়। এই কাব্য গ্রন্থ উর্দু সাহিত্যে, বিশেষ করে পাকিস্তানের জনমানসে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক, কম্যুনিষ্ট নেতা ও ফৈজের কারাগারের সঙ্গী সৈয়দ সজ্জাদ জহীর এই কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন—বহুতঅর্সা গুজর জানেকে বাদ যব লোগ রাওলপিণ্ডি সাজিশ কে মুকদমে কী ভুল জায়েঙ্গে অউর পাকিস্তান কা মুবরিখ, ১৯৫২ কে অহম্ বাকয়াত পর নজর ডালেগা তো গালিবন ইস গুলি কা সবসে অহমতারিখী বকয়া নজ্‌রো কী ইস ছোটি সী কিতাব কী ইশাअত কো হী করার দিয়া জায়গা" অর্থাৎ "অনেকদিন পরে যখন লোকে রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলার কথা ভুলে যাবে এবং পাকিস্তানের ঐতিহাসিকগণ ১৯৫২ সালের ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ করবেন সেদিন দেখা যাবে যে এই বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হল এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থের প্রকাশন।"

ফৈজ তাঁর কাব্যে নতুন ধারা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সেই শৈলী পুরাকালকে প্রত্যাখান করা হয় নি। বরং পুরাতন কাব্যশৈলী ও ধারার যোগ্য উত্তরাধিকারী তাঁর নূতন কাব্যশৈলী ও ধারা। ফৈজের মতে পুরাতনের মাঝেই নূতনের জন্ম।

ফৈজের কবিতার জীবিক—বিপ্লব ও প্রেম। বিখ্যাত উর্দু সমালোচক মুমতাজ হোসেন তাই বলেছেন—উসকী শায়রী মেঁ অগর এক পরম্পরা কৈস (মজনু) কী তো দুসরী মনসূর কী।" 'মজনু' প্রেমের প্রতীক। আর মনসূর হলেন পারস্যের বিখ্যাত সুফী দার্শনিক—যিনি আত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতার বিশ্বাস করতেন। তাই ধর্মীয় সংস্কার উপেক্ষা করে তিনি বলেছিলেন "অনলহক" অর্থাৎ সোঅহং—আমিই সেই।

ফৈজের কবিতার কথা বলতে গেলে প্রথমে মনে হয় তাঁর "সুবহে আজাদী (আগষ্ট -১৯৪৭ কবিতাটী কবি ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেন নি। তাই লিখেছিলেন:—

"ইয়ে দাগ দাগ উজালা, ইয়ে শব গুজীদা সহর
ওহ, ইন্তিজার থা জিসকা, ইয়ে ওহ, সহর তো নহীঁ
ইয়ে ওহ, সহর তো নহীঁ জিসকী আরজু লেকার
চলে যে ইয়ার কি মিল জায়গী কহীঁ না কহীঁ
অভী গিরানী এ শব মেঁ কমী নহীঁ আই
নজাতে দীদা ও দিল কী ঘড়ী নহীঁ আই
চলে চলো কি ওহ, মঞ্জিল অভী নহীঁ আই।
(এই আবছা আবছা আলো এই রাতের ছায়া মাখানো সকাল
যার প্রতীক্ষায় ছিলাম সে সকাল তো নয়।
এতো সেই সকাল নয় যার আকাঙ্খায়
বলেছিলাম বন্ধু—কোথাও না কোথাও পাব বলে
এখনও রাতের আঁধার শেষ হয় নি
হৃদয় ও চোখের মুক্তির সময় হয় নি
চল চল এখনও আসেনি আমাদের লক্ষ্য)

ফৈজ যেমন মেনে নেন নি ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতা, তেমনি তিনি স্বীকার করেন নি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। তাই তিনি বলেছেন :—

'বল রোজ অউর মেরী জান : থাকত কল হী রোজ
কুল কী হারেঁ। মেঁ যব লেনে গে মজদুর হাথ হল
অউর কুছ দের সিতম সহলে তড়ালে রোলে
অপনে আজাদ কী মীথাল হাথ মাজুর হাথ হল
(আর কিছু দিন আমার প্রিয়, কেবল আর কিছু দিন
অত্যাচারের মাঝে নিশ্বাস নিতে আমরা বাধ্য
আর কিছু দিন অন্যায় সহ কর। ছটফট কর, কাঁদ
এযে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সম্পদ তাই আমরা বিবশ)।

কিন্তু কবি এই বিবশতা কে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করেননি। এই অত্যাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন :—

"হমনে মানা যুদ্ধ বড়ী হায় সর ফুটেঙ্গে খুনাবেগা
খুনমে নহাতী বহ জায়েঙ্গে, হমনরহে, গমঁতী বরবেগা
(আমি জানি যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর, কত আঘাত কত রক্তের প্লাবন
রক্তে ধুয়ে যাবে দুঃখ, আমরা থাকবনা কিন্তু দুঃখেরও হবে অবসান।)

কবি চেয়ে ছিলেন সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন। ঐ পরিবর্ত্তন আসবে দুঃখের মাঝে—অনেক আত্মত্যাগের পর। কবির '.ইয়ে কসল উমী দোঁ কী হমদম" কবিতাটী এই চিন্তাধারার প্রতীক—

"সব কাটবো বিশ্বিল পৌষোকে।
যে আঁব সিসকেতে মত ছোড়ো
সং মোচ লো। কেবল ফুলৌকো
শাখো পে বিলকতে মত ছোড়ো
ইয়ে কল্ল উমীদৌ বী হমদম
ইস বার তী গারত জায়গী
সব মেহনত সুহ্বো, শার্মো কী
অবকে তী অকারত জায়গী
খেতৌ কে কোনে।—ঘুবরো মে
কিয় আপনে লহু কী খাদ ভরো
কিয় মিট্টি সীচো অন্তোসে
কিয় আপনী রুত কী ফিক্র করো
কিয় আপনী রুত কী ফিক্র করো
অব কিয় ইকবার উজড়না হ্যায়
ইক কল্ল পকী তো তয় পায়া
অবতক যো মহী কুছ করনা হ্যায়
(বিশীর্ণ চারা গাছগুলোকে কেটে ফেল
নির্জলা শুকিয়ে যেতে দিওনা।
ক্লিষ্ট ফুলগুলিকে তুলে নাও
গাছে শুকিয়ে যেতে দিও না।
এই ফসল বড় আশার বস্তু
এবারও নষ্ট হয়ে যাবে
সকাল সন্ধ্যার সব পরিশ্রম
এবারও অকারণে যাবে।
খেতের সমস্ত কোনা ঘুণছিতে
ভরে দাও এবার নিজের রক্তের সার
এবার ভেজাও মাটি চোখের জলে
তারপর চিন্তা কর পরবর্তী ফসল।
চিন্তা কর পরবর্তী ফসল
যখন আবার কাটা হবে
আগামী দিনের সোনালী ফসল।
ততক্ষণ এই ভাবেই এগিয়ে যাও।)

কৈফ কেবল এই আশার বাণী দিয়েই ক্ষান্ত হননি। সমগ্র জনমানসে তিনি চেতনা জাগাবার চেষ্টা

করেছেন। যারা সর্বহারা, যারা আজকের সমাজে পশুর মত জীবন যাপন করছে—তাদের মাঝে তিনি "অপমান বোধ" জাগাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর "কুত্তে" বা "কুকুর" কবিতাটি এই সাধনারই প্রতীক :—

"ইয়ে গলিয়ঁ কে আওয়ারা বেকার কুত্তে
কি বখশা গয়া জিনকো ছৌকে—গদাই
জমানে কী ফটকার সরমায়া ইনকা
জমাঁতর কী দুতকার ইনকী কমাই।
ন আরাম শব কো ন রাহত সবেরে
গলাজত মেঁ খর নালিয়েঁ। যে বসেরে
জো বিগড়ে তো ইক-দুসরে সে লড়াকো
জরা এক রোটীকা টুকড়া দিখাকো
ইয়ে ঘর এককী ঠোকরেঁ খানে ওয়ালে
ইয়ে ফাকোঁ সে উপতাকে মরজানে ওয়ালে
ইয়ে মজলুম মখলুক গর বার উঠায়ে
তো ইনসান সব সরবাশী ভুল যায়ে
ইয়ে চাহেঁ তো দুনিয়া কে অপনা বনা লেঁ
ইয়ে আকারেঁ। কী হড্ডিয়াঁ। তক চবা লেঁ
কোই ইনকো এহসাসে—জিল্লত দিলা দে
কোই ইনকী সোই হুই দুম হিলাদে।"
(এই গলির সব আওয়ারা বেকার কুকুরেরা
যাদের মাঝে বহুমূল শুধু ভিক্ষা প্রকৃতি
এযুগের উপেক্ষা যাদের একমাত্র পুঁজী
সারা পৃথিবীর দুর ছাই কেবল যাদের রোজগার,
নেই রাত্রির বিশ্রাম নেই সকালের অবসর
আস্তাকুড়ে এদের ঘর নালায় বসতি,
যদি বেচাল হয় তবে একে অন্যের সাথে লাড়িয়ে যাও
শুধু একটুকরো রুটী ফেলে দাও।
এরা সকলের কাছে উপেক্ষিত
এরা ক্ষুধার আগুনে দগ্ধ ও মৃত।
বিধাতার সৃষ্টি এরা যদি মাথা তোলে
মানুষ পায় সব অবজ্ঞা—উপেক্ষা ভুলে।
এরা চায় সমগ্র পৃথিবী করায়ত্ত করে
এরা নিজের প্রভুর হাড় পর্যন্ত চিবাতে পারে।

কেউ শুধু এদের অপমান বোধ জাগিয়ে দাও
কেউ এদের শায়িত পুঞ্জ তুলিয়ে দাও)

কবি সত্যের পূজারী। কবি বাক্ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর "বোল" বা "বল" কবিতায় তিনি বলেছেন -

"বোল কি সব জিন্দা হ্যায় অবতক
বোল, তো কুছ্ কহনা হ্যায় কহলে"
(বল সত্য জীবিত এখনও
বল, যা কিছু বলতে চাও বলে নাও)

এই প্রবন্ধ শেষ করব কবির বিখ্যাত গজল "শামে ফিরাক্" বা "বিদায় সন্ধ্যা" দিয়ে। এই গজলটিতে কবির প্রেমের কবিতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গজলটী বিখ্যাত গজল— গায়িকা স্বর্গতা বেগম আখ্তার তাঁর অসামান্য কণ্ঠে গেয়েছেন—

"শামে ফিরাক্ অব ন পুছ, আই আউর আকে টল গই
দিল থা কি ফির যহল গয়া, জাঁ থী কি ফির সম্ভল গই।
বজ্মে খয়াল মেঁ তেরে হুস্ন কী সময় ঢল গই
দর্দ কা চাঁদ বুঝ্গয়া, দিল্ কী রাত চল গই।
জব তুঝে ইয়াদ্ কর লিয়া, সুবহ মহক মহক উঠী
জব তেরা গম জগা লিয়া, রাত মচল মচল গই।
দিল সে তো হর মুআমলা সাফ্ কে চলে থে সাফ হম
কহনে মেঁ উনকে সামনে বাত বদল বদল গই।
আখিরে শব্ কে হম সবার ফৈজ নজানে কা হয়ে
রহ গই কিস জগহ সবা, হুস্নই কিধর নিকল গই।
(বিদায় সন্ধ্যা না জানি কখন এসে চলে গেল
হৃদয় ছিল তাই আবার ভাল লাগল, মন ছিল তাই আবার সরে গেল।
কল্পনার সভায় তোমার সৌন্দর্য্যের প্রদীপ জ্বলে শেষ হল
বেদনার চাঁদ অস্ত গেল বিচ্ছেদের রাত শেষ হল।
যখন তোমার আভায় আমার মনের সকাল গন্ধে গন্ধে আকুল
যখন তোমার বেদনায় বেদনার্ত্ত রাত ঘরো ঘরো ব্যাকুল
হৃদয়ের সব সমস্যার সমাধানে চলেছিলাম আমি
তবু সমুখে তোমার না বলা কথা বারে বারে হারাল,
রাত্রি শেষের সহযাত্রী ফৈজ না জানি কী হল
প্রভাত সমীর কখন বইল, সকাল কোথায় হল।

শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। দিল্লী শাখা। দাম দশ টাকা

সম্প্রতি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দিল্লী শাখা ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'শরৎচন্দ্র ও ভারতীয় সাহিত্য' নামক একটি বই বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। বইটিতে তেরোটি প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরা তাঁদের নিজ নিজ সাহিত্যে শিল্পী শরৎচন্দ্রের অবদানের মূল্যায়ন করেছেন। শরৎচন্দ্র শত বার্ষিকীতে এরকম একটি অনবদ্য বই নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়।

যদিও ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় বিনয়বশত গৌরবের ভারভাগটা সকলকে দিতে চেয়েছেন, তথাপি সকল বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁরা ধন্যবাদার্হ হবেন তাতে সন্দেহ নেই। আসলে আমাদের কিছু পণ্ডিত সমালোচক শরৎচন্দ্রের আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলো এলোমেলো পাশ্চাত্যনামের উল্লেখ করলেও তাতে শরৎচন্দ্রের পাঠক পাঠিকাদের নিরন্তর পাঠে কোন প্রতিবন্ধক ছায়া পড়ে না। উল্লিখিত বই-এর প্রথম প্রবন্ধ 'শরৎচন্দ্র ও আধুনিকতা' শ্রী ইন্দ্রনাথ চৌধুরী ঠিকই বলেছেন, 'ভাবপ্রবনতা বাঙালী জাতির বৈশিষ্ট্য। সেই জাতির চেতনা ও পরম্পরা থেকে মুক্ত হয়ে ত্রিভেদের গ্লানি কিম্বা কাফ্‌কার নিরাশ্বাস আতঙ্কের কাহিনী বা জয়েসের অনতিক্রমা নৈঃশব্দ প্রকট করার কথা মনোবৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতও স্বীকার করবেন না।' ডঃ চৌধুরীর বাংলায় লিখিত প্রবন্ধটি সুন্দর। এব্যাপারে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা পেলে ভালো হতো। হিন্দী সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক মদন নাথ গুপ্ত তাঁর বাংলায় লেখা প্রবন্ধ 'হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব বা আবেদন সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রেমচন্দের কথাও এসেছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় (ছিদ্রান্বেষী মন নিয়ে নয়) যে দুজনেই কালোত্তর মহৎ ঔপন্যাসিক। দুজনের রচনার পিছনে ছিল প্রগাঢ় দেশভক্তি আর কবিসুলভ সংবেদনশীলতা। হিন্দী সাহিত্যের লেখিকা মায়া গুপ্ত তাঁর বাংলায় লিখিত প্রবন্ধে বহু আলোচিত বিষয় অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র ও হিন্দী কথা সাহিত্যের উপর তার প্রভাব এ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যিকগণ শরৎভাবর্ত থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। তবে বর্তমানের শরৎ চরিত্র থেকে হিন্দী সাহিত্যে আকস্মিক অনুসরণ হচ্ছে একটু মডিফায়েড হয়ে। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য। আসলে বহুদিন আগেই হিন্দী সাহিত্যিকদের দূরদৃষ্টির ফলে শরৎচন্দ্রের বীজগুলি সুচক্র জাত হয়ে হিন্দী সাহিত্যে ভবিষ্যৎ অনুসরণের গভীরতা বাড়িয়েছে। সিন্ধী সাহিত্যে ও সমাজমানসিকতায় শরৎচন্দ্র কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন তা সিন্ধী সাহিত্যের সুপরিচিত গবেষক ডঃ এস.এম. কামিলানির 'সিন্ধী সাহিত্যে ও জীবনে শরৎচন্দ্র' নামক বিদগ্ধ প্রবন্ধটি না পড়লে বোঝা যেত না। লেখক প্রথমেই বাংলাদেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কিম্বা গোখেলের বহু পরিচিত উক্তিটির প্রতিধ্বনি করেছেন যে, 'That Bengal thinks today, India thinks tomorrow. ডঃ কামিলানি তৎকালীন বাংলা সমাজে নারী ও সিন্ধী সমাজে নারীর স্থান বিষয়ে সাদৃশ্য খুঁজেছেন। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন সম্পাদক। বাংলা ভাষার নিকটতম প্রতিবেশী সাহিত্যে নেপালীতে ডঃ পরশমণি প্রধান জাতীয় সংহতি নামক প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্র ভারতের সবভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। ফলে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে

সাহিত্যের মাধ্যমে ডঃ প্রধান তাঁকে অগ্রদূত হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তবে শেষ প্রশ্নের আশুবাবুই শরৎচন্দ্র এ ধরণের identification শিল্পাদর্শকেই ক্ষুণ্ণ করে বলে আমার ধারণা। ডঃ চক্রকান্ত বেহেরা বাংলায় লিখিত প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রকে গুজরাটীদের একান্ত আত্মীয় বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই জন্যই তিনি বলতে পেরেছেন যে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস লিখে শরৎচন্দ্র বাংলার মন গুজরাতেরও পল্লীজীবনের ঔপন্যাসিক হয়ে উঠেছেন। কে. ভি. রমন রেড্ডি 'তেলেগু সাহিত্যে শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় যা পরিত্যক্ত— যা অতীত সেই সব প্রাচীন সংস্কারের প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীই হাজার হাজার যুবপাঠককে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এ মূল্যায়নে যে কতবড় ভুল তা তাঁর প্রবন্ধাবলী ও চিঠিপত্র পাঠ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আসলে বর্তমানে হাজার হাজার যুবকের শরৎ-রচনা থেকে দূরে থাকার কারণ বিবর্তিত সমাজ। মানব চৈতন্যের প্রাতিভাসিক ধারা না বদলাক তার ক্রমেডীয় জটিলতা নিরন্তর বেড়েই চলেছে। শরৎচন্দ্র প্রাচীন গৌরবময় হিন্দু সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু তিনি মোটেই তার অপসংস্কারের কোনোদিনই হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। সমাজ ব্যবস্থার ভেদবুদ্ধির প্রশ্নে তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অনভিপ্রেত ছিল। আবার এও তিনি জানতেন যে নিরপেক্ষ শিল্প অবাস্তবের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী। কন্নড সাহিত্যের লেখিকা বাসন্তী পাড়ুকোণ একেবারেই একটি ছোট নিবন্ধে মায়া গুপ্তের মতো শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের পর্যালোচনা করেছেন। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজে নারীনিগ্রহের প্রতি শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদ আজ হিতৈষণার আন্তরকৃত্য হিসেবে স্বীকৃত। শ্রীআদর্শবাদী ভট্টাচার্য তাঁর দুটি প্রবন্ধের প্রথমটিতে তামিল সাহিত্যে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে গলসওয়ার্দির সঙ্গে তুলনা করেছেন শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনার প্রতি দৃষ্টি রেখে। এই প্রসঙ্গে আমার শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির কথা মনে আসছে। আশালতা সিংহ শরৎচন্দ্র ও গলস্‌ওয়ার্দি নামক একটি প্রবন্ধে সম্ভবতঃ প্রবাসীতে লিখেছিলেন। তাতে শরৎচন্দ্র লক্ষ্ণৌর জনৈক পঠিকাকে লিখেছিলেন যে, সকলেই আমার সঙ্গে গলস্‌ওয়ার্দি না কারসঙ্গে যেন তুলনা করেন। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর একটিও উপন্যাস এখনও পড়িনি আসলে শরৎচন্দ্র তো খোলাখুলি ভাবেই বলে দিয়েছেন, 'সমাজ সংস্কারকের দুরভিসন্ধি আমার নেই, তাই বই এর মধ্যে আমার মানুষের দুঃখবেদনারই বিবরণ আছে, সমস্যাও আছে, সমাধান নেই। এ কাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তাছাড়া আর কিছুই নই। শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর 'শ্রীলংকার মানুষদের কাছে শরৎচন্দ্র' নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমাদের প্রতিবেশী দেশেও শরৎচন্দ্র কিরকম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন তা দেখিয়েছেন। তেলেগু সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক গোরেপতি বেঙ্কট সুব্বাইয়া—শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যের উপর প্রথম বই 'শরৎ-দর্শনম্' রচনা করেছিলেন। 'অনন্য কথাকার শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে তিনি শরৎচন্দ্রের উপর পূর্বসূরী বাংলা লেখকদের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই কবি ও দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেই উদ্ধৃতি দিয়েই এই আলোচনার ছেদ টানতে পারি। As for Bengali, we have had Bankim, have still Tagore and Saratchandra. That is achievement enough for a single century." শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের বাঙালী পাঠকদের এটাই বিশেষ গৌরব।

বই-এর তেরোটি প্রবন্ধের আটটি অনুবাদ, বাকী পাঁচটি লেখকরা বাংলাতেই লিখেছেন। অনুবাদের ভাষা মাঝে মাঝে একটু শিথিল হলেও বাংলাসাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও অনুরাগ অনুবাদকে সামগ্রিক-ভাবে সুন্দর করেছে। পরিশিষ্টে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যে অনূদিত শরৎ-সাহিত্যের সুনির্বাচিত তালিকা এই বইটিকে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এ বিষয়ে পাঠক সাধারণ নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

—বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

যদিচ দ্রুততর গতিতে যেতে চাও আমার মঙ্গলে, তবু
কূটজ সুরভিত পাহাড়ে পর্বতে দেখছি কিছুকাল কাটবে ;
নয়নে জলে ভরা মধুর কেকারবে স্বাগত বন্দনা জানাবে,
বিদায়নিয়ে তুমি যতোটা সম্ভব ত্বরায় যেতে কোরো চেষ্টা ॥
তোমার দর্শনে আকোটা কেতকীরা সাজায় উজান রতি
পাণ্ডু আভা দিয়ে, পক্ক জম্বুতে শ্যামল যার বন প্রান্ত ;
গ্রামের পথ তরু মুখর কাকলীতে কাকেরা নীড় বাঁধে যেথা,
অচির আম্র বাসী হংসের সেই দশার্ণ গ্রাম ॥
যেখানে রাজধানী বিদিশা নাম তার চতুর্দিকে বিখ্যাত
সেথায় পাবে তুমি সত্ত সম্ভ পূর্ণফল কামনার,
করবে পান স্বাদু বেত্রবতী নীর স্খলিত সুন্দর প্রান্ত
উর্মি চকল ভ্রূকুটি সুন্দর সে যেন আননের মতো ॥
পূর্ণবিকশিত কদম্বফুল আর তোমার সংস্রবে ছুই
নীচে নামে গিরি সেখানে কিছুক্ষণ গ্রহণ কোরো বিশ্রাম,
শৈল শিলাগৃহ পশ্যমনীর রতির পরিমল-যুক্ত
ঘোষণা করে সেথা নাগর নায়কের মত্ত যৌবন লীলা ॥
বন নদীর তীরে ফুটেছে উদ্যানে শুভ্র যূথিকার কুঁড়ি,
নবীন জলকণা ছিটিয়ে দেও তুমি ক্ষণেক বিশ্রাম শেষে,
তপ্ত কপোলের দারুণ দাহে যার ক্লান্ত কর্ণোৎপল
অচির-পরিচিত পুষ্প চয়নীর আননে ছায় ধান কোরো ॥
যদিচ উত্তরে তোমার পথরেখা তবুও বঙ্কিম পথে
বিফল কোরো নাকো উজ্জয়িনী-পুরী সৌধতল প্রার্থনা,
পুরাঙ্গনাদের সুরিত বিদ্যুৎ চকিত চকল নেত্রে
যদিনা সন্ধান কর আনন্দের, লোচন-বঞ্চিত তুমি ॥
চলেছে এঁকে বেঁকে স্খলিত সুন্দর জলনী নাম নির্বিন্ধ্যা,
ঘূর্ণি নাভিখানি যেথায় কৌশলে, উর্মি কলতানে মুগ্ধ
বিহগশ্রেণী তার কাকী, পথে যেতে সরস হও সংগমে ;
নাগরমণীর প্রিয়ের প্রতি তার বচন প্রণয়ের আজ্ঞ ॥
তটের তরু হতে পর দল ঝরে' মলিন হলো যার বর্ণ,
জলের ধারা যার বেণীর মতো ক্ষীণ সূচনা করে সৌভাগ্য
প্রোষিতভর্তৃকা তোমার বিরহের, ভাগ্যবান তুমি মেঘ ;
কৃষ্ণা সিন্ধুর সে করে হয় দূর বিধান কর তুমি ভাই ॥
গ্রাম্য বৃদ্ধেরা যেথা অবন্তীর কোবিদ উদয়ন কথায়
যেথান থেকে যাবে পূর্ব কথা মতো স্বচ্ছ বিশালায় পুরী ;
সে যেন পৃথিবীতে দিব্যকান্তির খণ্ড, সুকৃতির শেষে
মর্ত্যে-ফিরে-আসা স্বর্গবাসীদের শেষের পুণ্যের ফল ॥
দীর্ঘায়ত করে' কূজন সারসের মধুর ক্রেঞ্চার ধ্বনি
বাতাস, প্রভাতের কমল গন্ধের মৈত্রী বহনে স্নিগ্ধ ;
শিপ্রাতটবায়ু সেথায় রমণীয় অঙ্গে অনুকূল লয়,
কামনা-চাটুকার নায়ক প্রিয়তম, সুরত গ্লানি করে দূর ॥
জানালা থেকে উঠে সুরভিকেশধূপ তোমার দেহ দেবে ভরে',
নৃত্য উপহারে ভবন ময়ূরের প্রীতির পরিচয় পাবে,
কুসুম-সুরভিত, ললিত কবিতায় অলক্তক রাঙা সৌধের
লক্ষ্মী দর্শনে অচিরে কোরো দূর ক্লান্তি ভ্রমণের মতো ॥
সাদরে তৃতগণ দেখবে তোমাতেই প্রভুর কণ্ঠের নীল,
যখন যাবে তুমি, ত্রিলোক বন্দিত পুণ্য মহেশের ধাম ;
সেখানে কুবলয় রেণুর সৌরভে গন্ধবতী জল কেলি,
যুবতীদের স্নানে মন্দির বাতাসের আন্দোলন উদ্যানে ॥
যদি বা জলধর, মহেশ মন্দিরে অন্যকালে যাও তুমি,
সেখানে স্থির থেকো তোমার দৃষ্টির গোচর যতোখন সূর্য,
তাহলে সম্ভ্রম সন্ধ্যা আরতির মৃদঙ্গে ধ্বনি তুলে গাঢ়
নয়নমতুল তোমার স্বজনের পূর্ণফল পাবে তুমি ॥
নৃত্য তালে তালে ধ্বনিত মেখলার ক্লান্ত করে টানে নটীরা
রত্নছায়ার খণ্ড যার সেই চামর, লীলায়িত ভঙ্গী
পেয়েছে নখপদ সুখের সন্ধান তোমার নব বর্ষণে,
তোমাকে হানে তাই মৃদু কটাক্ষের দীর্ঘ অমরের পঙ্‌ক্তি ॥
তরুর উন্নত-বাহু অরণ্যের চতুর্দিকে হও লীন,
সন্ত পুষ্পিত জবার রক্তিমা কোটাও সন্ধ্যার রাগে,
তৃপ্ত কর তুমি নৃত্যময় শিব-আর্দ্র নাগাজিন বাসনা,
ভবানী দেখবেন ভক্তি, উদ্বেগ—শান্ত অচপল দৃষ্টি ॥

With best compliments of

ESTD—1919

HUKUMCHAND JUTE MILLS LIMITED

Regd. office : 15, INDIA EXCHANGE PLACE
Calcutta—700 001

Telegram : "HUKUMILLS" Calcutta
"HUKUM" CA-2771

: 22-3411 (5 lines)

JUTE MILLS DIVISION

Manufacturers & Exporters of :
Quality Hessian. Sacking Carpet Backing cloth Twine. Cotton Bagging Jute yarn. Jute Felt etc.

CHEMICALS DIVISION

Manufacturers of :
Caustic Sodalye (Rayon Grade)
Liquid chlorine, Hydrochloric Acid
Hypochlorite

MILLS AT :
Naihati. P.o. Hazinagar
Dist. 24-Parganas
(West Bengal)

PLANT AT :
P.o. Amlai Paper Mills
Dist. SHAHDOL
(M. P.)

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

কি ভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন

খুবই দুঃখের সঙ্গে জানান হচ্ছে যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সঙ্কট থাকবে। তবুও কষ্টের ওটার জন্যে যে ধরণের প্রচেষ্টা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাও হচ্ছে।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন।

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে বিবেচনা আনুন। অপচয় বন্ধ এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। বড়ো বড়ো আলো ও পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের বন্ধু করুন। এই ভাবে আপনি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সরাসরি পরিবর্তনের কিছুটা সাহায্য করতে পারবেন।

অনুরোধ করা যাচ্ছে যে ঘরে যত আলো পাখা আছে সেগুলি ও টিউবলাইট, হিটার ইত্যাদি বন্ধ করুন এবং এই সময় শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বেশি করতে।

আরও কিছু করুন :

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে পাখা বন্ধ করা হয়েছে। সকাল ১০-৩০ থেকে বেলা ১২টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, তবুও যে সব ক্ষেত্রে চালু রাখার প্রয়োজন হয় সেগুলি ছাড়া বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ঘিঞ্জি এলাকায় উৎসব উপলক্ষে নিয়ন, সাজসজ্জা প্রভৃতি বন্ধ করা হয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা নিতে হবে।

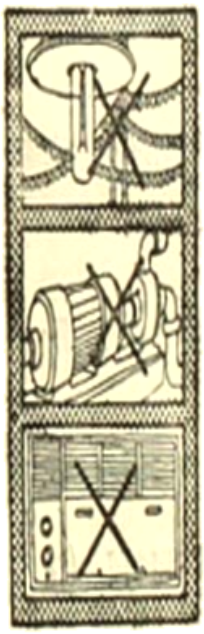

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

সবিনয় নিবেদন

অনুবাদ পত্রিকা এই জানুয়ারীতে চার বছরে পড়লো। শুধুমাত্র অনুবাদের জন্য একটি পত্রিকার পরিকল্পনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। আমরা বিশ্বাস করি, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ছাড়া জাতীয় সংহতি আন্তর্জাতিক মৈত্রী দীর্ঘজীবী হতে পারে না।

○ এই পত্রিকায় দেশী বা বিদেশী সাহিত্যের ছোট গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। ভাষাতত্ত্ব বা যে কোন আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা বা সাহিত্যের উপর মৌলিক প্রবন্ধও গ্রহণ করা হয়।

○ পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশ হয়।

○ প্রতিটি সংখ্যার মূল্য তিন টাকা। বার্ষিক সডাক মূল্য বারো টাকা। পত্রিকা সাধারণ ডাকে পাঠানো হয়। ভি. পি. পি. বা বিশেষ ডাক ব্যবস্থার জন্য আলাদা মাশুল দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

○ পাঁচটির কম পত্রিকা নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এবং এজেন্টদের আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

যোগাযোগের জন্য লিখুন
মনোজ সরকার (সহ সম্পাদক)
অনুবাদ পত্রিকা
৮বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৯

With

Best Compliments

from

BHATKAWA TEA COMPANY LTD.

Meleod House

3, NETAJI SUBHAS ROAD.

CALCUTTA--700 001

Telephone : 23-6938

With Best Compliments of :

Ramkumar Rajendra kumar

1, Bonefield Lane

Calcutta—1

With

Best

Compliments from :

CALCUTTA HARDWARE SUPPLY AGENCY

৮ বি. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে শ্রীবাণী সরকার ও শ্রীবৈশম্পায়ন ঘোষাল কর্তৃক প্রকাশিত
এবং নিউ টাইমস্ প্রিন্টার্স, ৪০১, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।